অনুবাদ—বিমল দত্ত

প্রথম প্রকাশ—পৌষ, ১৩৬৫। দ্বিতীয় মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক—বি. বি. রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭এ বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ চিত্র
মৈত্রেয়ী দেবী

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

—চার টাকা

পরিচায়িকা

১৯৫৫ সালের ১১ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরের পর এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের 'কাশ্মার প্রিন্সেস' স্বারাকের নিকটে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বিধ্বস্ত ও নিমজ্জিত হয়েছে, আর এইভাবে হংকং থেকে জাকার্তায় প্রত্যাশানুরূপ স্বাভাবিক নিরাপদ আকাশ অতিক্রমের পরিবর্তে এ যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটল ভাগ্যবিপর্যয়ে। বিমানের সঙ্গে সব যাত্রীর সলিলসমাধি হয়, যেমন হয়েছে বীর ক্যাপটেন জাতার ও সাহসিকা এয়ার-হোস্টেস গ্লোরিয়া বেরীর, যাঁরা, বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপন কর্তব্যে অটল ছিলেন। পূর্বতন সংবাদ অনুসারে এঞ্জিনের আগুন বিমান বিধ্বংসের হেতু। আমরা এখন জানি যে এই বিমান দুর্ঘটনা, এর সকল যাত্রী ও কর্মিবৃন্দের এই সাংঘাতিক সর্বনাশ, এক আন্তর্জাতিক অপরাধ ও হত্যাকাণ্ডের অংশবিশেষ।

কাশ্মীর প্রিন্সেসের পরিণতি আর-একটি বিমান দুর্ঘটনামাত্র নয়, বরং এ এমন এক আন্তর্জাতিক অপরাধ যা অনাবিষ্কৃত না হয়েও অদণ্ডিত রইল। এর দায়িত্ব শুধু সেই কলুষিত হাতদুটোর ওপরেই নয় যে হাতদুটো বিমানে টাইম বম্ব রেখে দিয়েছিল,—যারা এই হীন কাজে প্রশ্রয়, প্ররোচনা ও ব্যবস্থাপনা করেছিল তাদের ওপরেও দায়িত্ব আছে। অসহিষ্ণুতা, উত্তেজনা ও বিশ্বসংঘাতের এ এক শোচনীয় অংশমাত্র, যার প্রতাপে পৃথিবী যুদ্ধ ও বিলুপ্তির আশঙ্কায় অভিভূত।

পরবর্তী পাতাগুলি, দুর্ঘটনা- থেকে রক্ষা -পাওয়া বিমান কর্মীদের কাহিনী। কো-পাইলট ক্যাপটেন দীক্ষিত, ফ্লাইট ন্যাভিগেটর পাঠক ও অনন্ত শ্রীধর কারনিক, কেবল এই তিনজন কর্মীই রক্ষা পেয়েছেন। কাহিনীটি জীবন্ত, স্পষ্ট ও মর্মস্পর্শী।

ব্যঙ্গার্থক বোধ হয় যে, এক দুর্ভাগ্যের মধ্যে থেকে, এক্ষেত্রে এক অমানুষিকতার মধ্যে থেকে, সহিষ্ণুতা আর বিরূপতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের

চূড়ান্ত বীরবত্তার এক মহাকাব্য জন্ম নিল। অনন্ত শ্রীধর কারনিক নিজেই বলেছেন যে তিনি বা তাঁর বন্ধুরা কেউই তাঁকে 'বীর' বলে মনে করতেন না। তিনি একজন এয়ারক্রাফ্‌ট গ্রাউণ্ড ই‍ি
তাই থাকতেই পছন্দ করেন। মনোবিলাসের জন্যে তিনি দুঃসাহসিকতা বা দুর্যোগের সন্ধান করেন নি, তথাপি এ দুয়েরই সম্মুখীন হয়েছেন যথোপযুক্ত সাহস, নিষ্ঠা ও কর্মানুরক্তি সহকারে।

কোনো বিমানযোগে যখন আমরা উন্মুক্ত মহাসমুদ্র পাড়ি দিই, পরিবার স্ট্য়াড্রেস প্রদর্শনীর জন্যে একটি লাইফ-বেল্ট গায়ে দেন আর সেই অতিপরিচিত কথাগুলি বলেন, "যেহেতু লাইফ-বোট ড্রিল বিমানে এক সাধারণ বিধিমাত্র, জরুরী অবস্থায় জলে নামতে হওয়ার নিতান্ত অসম্ভাব্য পরিস্থিতিতে প্রস্তুত থাকবার জন্যে আমরা লাইফ-জ্যাকেট ব্যবহারের পদ্ধতিটা আপনাদের দেখিয়ে দিতে চাই..." তখন আমরা প্রায় সকলেই সাবারণত হেসে থাকি, আর অতি অল্পসংখ্যক জনাকয়েক একে সত্যি কোনো গুরুত্ব দেন। অন্তত এই একটি উদাহরণ উপস্থিত যখন লাইফ-জ্যাকেট, আর কারনিক ও তাঁর বন্ধুদের প্রদর্শিত গুণাবলীর সহযোগে তাঁদের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে, রক্ষা পেয়েছে এ কাহিনী বর্ণনার অবকাশ। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, প্রত্যেক পাঠক এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় বিমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট হবেন, যেমন আমি হয়েছিলাম। বেশ বলা চলে যে, এয়ারক্রাফ্‌ট ইঞ্জিনীয়াররাও ভালো লেখক হতে পারেন, তবু প্রত্যেকে শুভেচ্ছা পোষণ করবেন যে, কারনিক যেমনভাবে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন তার প্রত্যাশায় যেন এমন ঘটনাবলী বা মরণোন্মুখ অবস্থার প্রতীক্ষা করে না থাকতে হয়। যা বলা হয়েছে ও যেমন ভাবে বলা হয়েছে, এ অনুভূতিই তার প্রকৃষ্টতম সাক্ষ্য।

ব্যাখ্যা অথবা সংক্ষিপ্তসার করতে গিয়ে কাহিনীর রসহানি ঘটাব না। আমি আশা করি, পাঠকেরা যেন লেখকের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও গভীর মনোবেদনার অংশভাক্ হতে পারেন, যেমন আমি হয়েছি। যে দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার স্বাদ এই বইয়ে পাওয়া যায় তাকে গল্প-

কথা বলে মনে হয়, আর সময়ে সময়ে সত্যকাহিনী বলে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে ওঠে; আর মাঝে মাঝে, শোচনীয় হলেও, ঘটনাবলীর মর্মস্পর্শী নাটকীয়তায় এর কঠিন বাস্তবতার বোধ লোপ পেয়ে যায়।

'কাশ্মীর প্রিন্সেস' দক্ষিণ চীন সমুদ্রে ধ্বংস হল। দুঃসাহসী ক্যাপটেন জাতার, যাঁর বীরত্ব আর কর্তব্যনিষ্ঠার কথা কারনিক লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি নেহাত সহজভাবে এ দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন! চীনা ও অপরাপর যাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ ও মনোবল, এয়ার হোস্টেস গ্লোরিয়া বেরীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্মিবৃন্দের নিয়মানুগত্য, এ সবই ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। আশা হয়, এ বই বিশ্বব্যাপী এক পাঠক-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে, আর পৃথিবীর বিবেক-বুদ্ধিকে নাড়া দিতে সাহায্য করবে, এবং জাগাবে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের এমনতর অপরাধের বিরুদ্ধে মহত্তর আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধ।

ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জবাসীদের কিংবা এইচ. এম. এস. ড্যাম্পায়ারের ক্যাপটেন ও কর্মিবৃন্দকে, অথবা আরো যাঁরা সাহায্য ও সান্ত্বনা দান করেছেন কারনিক ও তাঁর সহকর্মীদের—তাঁদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যে পৃষ্ঠাগুলিতে, সেগুলি কম মর্মস্পর্শী নয়।

'শান্তি-সৌভ্রাত্র ও সেবার' দূত ক্যাপটেন জাতার, ডি-কুন্‌হা, পিমেণ্টা, ডি-সুজা, গ্লোরিয়া বেরী আর সেই এগারো জন চীনা ও অন্যদেশী যাত্রী, যাঁরা আন্তর্জাতিক হত্যাকাণ্ডের কুচক্রে জীবন হারালেন, তাঁদের মহিমময় স্মৃতির উদ্দেশে লেখকের উৎসর্গপত্রে উচ্চারিত শ্রদ্ধার্ঘ্যের প্রতিধ্বনি করার চেয়ে প্রকৃষ্ট পথ আর নেই।

এ বই তাঁদের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত। দুর্ঘটনার বহু বৎসর পরে, লেখকের মতো আমিও সেই ভয়াবহতা অনুভব করি যেমন অনুভূতি পাঠকেরা বোধ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

তাঁর সঙ্গে সমুদ্র সাঁতরে যাঁরা ফিরে এসেছেন, কারনিক আর তাঁর বন্ধুদের আমরা স্তুতিবাদ করি ও সৌভাগ্য কামনা করি।

নয়া দিল্লী। ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৮। ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন

সন্ধ্যে তখনো হয় নি ; সূর্য তখনো দিগন্তের অনেক উপরে। 'কাশ্মীর প্রিন্সেসে'র এঞ্জিনগুলি মৃদু মধু গুঞ্জন তুলে চলেছিল। নীচে প্রসারিত চীন সাগরের ঘন নীলিমা। সামনে জাকার্তা।

বিস্ফোরণের অশুভ শব্দ সারা বিমানে এক শিহরণ তুলে দিল। অকস্মাৎ নীরব হল কথাবার্তা, প্রত্যেকের মুখে নেমে এল আতঙ্কের ছায়া। প্রজ্বলন্ত ডান দিকের পাখা নিয়ে মর্মান্তিক ভাবে আহত ঈগলের মতো 'প্রিন্সেস' সমুদ্রের বুকে অবতরণের, যদিও অসফল, তবু এক অসমসাহসিক প্রয়াস করল।

সেই সন্ধ্যায় কেবিন ও কক্‌পিটের স্বল্প পরিসরে যে বীর্যবত্তা প্রকাশিত হয়েছিল, তা কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্বের চেয়ে কম ছিল না। ক্যাপটেন জাতার, শান্ত ও অবিচলিত স্বরে, শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ার রাশকে উপেক্ষা করে, কন্‌ট্রোল আয়ত্ত রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে করতে আদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্লোরিয়া বেরী লাইফ-জ্যাকেট বিতরণে আর যাত্রিবৃন্দকে ওগুলি পরতে সাহায্য করছিলেন। যাত্রীরাও স্থির হয়ে আপন আসনে বসে ছিলেন।

পত্র-পত্রিকায় শিরোনামা অধিকার করে দিন কয়েক থাকবার অনতিপরে এ ঘটনা এক মহত্ত্ব আহরণ করে নিল। যে দৈবশক্তির সহায়ে মানুষের পক্ষে মহাকাশ বিজয় সম্ভব হয়েছে, তা আজও কার্যকরী, আজও বিজয়ী—এ সত্যের এ অভিজ্ঞান হয়ে রইল।

আমাদের প্রাণরক্ষা পেল যাঁদের আত্মবলিদানে তাঁদের স্মৃতির প্রতি সকৃতজ্ঞ, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আমি সবিনয়ে প্রণতি জানাই। তাঁরা আর আমাদের মধ্যে রইলেন না, তবু তাঁদের নাম ও স্মৃতি বহুকাল

জীবিত হয়ে থাকবে। জন কয়েক বন্ধু ক্যাপটেন জাতারের পূর্ণাকৃতি আবক্ষ এক প্রতিমূর্তি বম্বে বিমান বন্দরের টারমিনাল বিল্ডিংএর প্রধান প্রবেশপথে সংস্থাপনার প্রস্তাব করেছেন। সে মূর্তি স্থাপিত হলে, ভারতীয় বৈমানিকতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রতীকস্বরূপ থাকবে। তদ্‌ব্যতীত উত্তরকালের ভারতীয় বৈমানিকদের সামনে এ হবে এক পথপ্রদর্শক।

এ বই পাঠ করার অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সরল ভাষায় সহকর্মীদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনে, গুণমুগ্ধ হৃদয়ে শ্রীকারনিক অপূর্বভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এক দুঃখবহ মানবিক অভিজ্ঞতা। আমার বিশ্বাস, অগণিত পাঠকের মনেই প্রত্যয় জাগাবে যে, যদি দক্ষতা কখনো সাহসিকতার মন্ত্রে সুসজ্জিত হয় তাহলে জীবনে এমন কোনো বিরাট বাধা আসতেই পারে না, যার সম্মুখীন হতে না পারা যায়।

নয়া দিল্লী

১০ই এপ্রিল, ১৯৫৮ এম্‌.সি.দীক্ষিত

এক মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে আমার বন্ধু অনন্ত কারনিকের এই বই কাশ্মীর প্রিন্সেস সম্পর্কে কিছু লিখতে বসেছি।

জীবনের শোকাবহ ঘটনা আবার মনে জাগা খুব সুখের নয়, কিন্তু কারনিক এই বইয়ে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাচ্ছেন, যে ষোলোজন নিরপরাধ ব্যক্তি ঐ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ; আর আমি তাঁরই মতো একজন, দৈবক্রমে নিস্তার-পাওয়া কর্মী, স্বভাবতই এ অর্ঘ্যদানে সহযোগী হতে চাই।

যাঁরা এমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মনে পড়া স্বাভাবিক। ক্যাপটেন জাতারকে আমার মনে পড়ে একজন সেরা কমাণ্ডার হিসেবে, যাঁর অধীনে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি কখনো ভুলতে পারব না সেই শান্ত দৃঢ়চিত্ত অনমনীয় সাহস, অমানুষিক বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যার পরিচয় দিয়েছিলেন, আর যার জন্য আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছিল।

আমাদের সহকর্মী কেন্ ডি-কুন্হা, সেডরিক ডি-সুজা, জ্যো পিমেণ্টা—এঁদের বন্ধুত্বের আর সহযোগিতার কথা চিরকাল স্মরণে থাকবে, কর্তব্যে তাঁদের নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা আর অনুকরণীয় সৎসাহস বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব।

পরিশেষে, কি করে আমি ভুলতে পারি মনোরমা গ্লোরিয়া বেরীকে, যাঁর হাত দুটি থেকেই আমি আমার লাইফ-জ্যাকেটটি পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম আমার প্রাণরক্ষার পথ ; আর মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও যাঁর ধীর নৈপুণ্য যাত্রী ও কর্মীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

লণ্ডন

১৪ই মার্চ, ১৯৫৮ জে· সি· পাঠক

'বিমান থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন না কি ?'

'জলের থেকে কারা উদ্ধার করল আপনাদের ?'

'আগুন লাগতে দেখে যাত্রীরা কেউ আর্তনাদ করেন নি ?'

—বন্ধু আর সহকর্মীদের কাছ থেকে এমনি ধারা অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাকে। এই বন্ধুদের কথা মনে করেই 'কাশ্মীর প্রিন্সেসের' অন্তিম যাত্রার বিবরণী লিখতে বসেছিলাম। বর্ণনা-কালে আমার সহকর্মীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে পেরেছি, অমিতসাহস সত্ত্বেও যাঁরা বলি হলেন নিদারুণ দুর্যোগের।

ব্যক্তিগতভাবে যে কথাবার্তা শুনি নি, বা যে দৃশ্য দেখি নি সেগুলি আমার জীবিত সহকর্মীদের সংবাদ অনুযায়ী বা পরবর্তী কালে কর্মীদের আত্মীয়বর্গের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদ অনুসারে গড়ে নিয়েছি। শুধু কর্মীদের ভাবনা-চিন্তার চিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী উপস্থিত করার ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি।

লেখক নই বলে রচনা বহু ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। তবু ভরসা করি, দোষত্রুটি মার্জনা করা হবে, কারণ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির উদ্দেশ্য 'কাশ্মীর প্রিন্সেসের' অন্তিম যাত্রার বিবরণী দান করা।

বোম্বাই

১১ই এপ্রিল, ১৯৫৮ — এ.এস.কারনিক

উৎসর্গ

আমার এখনো মনে হয় যেন দুর্ঘটনাটি সবেমাত্র হল, বিমানের আরোহীদের স্মৃতি আমার মনে এত স্পষ্ট। গ্লোরিয়াকে আমি দেখতে পাচ্ছি ঘন কালো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অবর্ণনীয় সাহস নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। হাতে কতকগুলি লাইফ-জ্যাকেট। অবিচলিত পদক্ষেপে কক্‌পিটের দিকে তিনি এগিয়ে চলেছেন। ক্যাপটেন জাতার সর্বশক্তি নিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত ধরে আছেন নিয়ন্ত্রণের চাকা, বিমানকে সমতা রেখে পরিচালনা করার দুঃসাহসিক প্রয়াসে—বিক্রমে স্থির। কমনীয় মুখে ভয়ের রেশমাত্র নেই, অবিচলিত স্বরে নির্দেশ দিয়ে চলেছেন তিনি। ডি-কুন্‌হা ত্বরিত হাতে একের পর ইঞ্জিনের কন্‌ট্রোলগুলি চালনা করছেন, অসংখ্য নির্দেশক ডায়ালে দৃষ্টি নিবদ্ধ, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসাধারণ তৎপরতায় ক্যাপটেনের আদেশ পালন করে চলেছেন ; ডি-সুজা আর পিমেণ্টা, যাঁরা সর্বক্ষণ যাত্রীদের পাশে ছিলেন আর গ্লোরিয়ার সাহায্যে লাইফ-জ্যাকেটে সুসজ্জিত করে দিয়েছিলেন।

আর সেই যাত্রীরা—আটজন চীনা, একজন ভিয়েৎমিন, একজন পোলিশ আর একজন অস্ট্রিয়ান। আমি কখনো কল্পনা করতে পারি নি যে সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষ মৃত্যুর সামনে এমন ইস্পাত-দৃঢ় মনোবল নিয়ে দাঁড়াতে পারেন। এমনকি যুদ্ধের সময় সুইসাইড স্কোয়াডের আত্মঘাতী কাজের অবকাশে লোকেরা ভয়ের লক্ষণ দেখাতে পারে। কিন্তু এঁদের হৃদয় ইস্পাতে গড়া, কেউ বিচলিত হলেন না, ভয়ের লেশ পর্যন্ত কারো মুখে নেই। তাঁরা কঠোর ভাবে নিজেদের আসনে বসে রইলেন, ডানদিকের সর্বগ্রাসী আগুন কিংবা শ্বাসরোধকারী কালো ধূমরাশি, যা কেবিন আর তাঁদের ফুস্‌ফুসকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল, তার

দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র করলেন না। নম্রতার কাছে মৃত্যু কখনো এমন উপহসিত হয় নি। মানুষের সাহস কোনোদিনই এমন মহত্ত্ব পায় নি। আমি আশা করি আমার যদি বর্ণনা করার যোগ্য ক্ষমতা থাকত, দায়িত্ব পালন করতাম বিশদ বিবরণী দিয়ে সেই সাহসের, কর্তব্য-অনুরাগের আর আমাদের পাঁচজন সহকর্মীর আত্মবলিদানের—যাঁরা, দুঃখের বিষয়, আর নেই ; আর সেই দুই বন্ধুর যাঁরা আমার সঙ্গে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বিভীষিকার অংশভাক্ হয়েছিলেন আট ঘণ্টা ধরে, যখন মৃত্যু আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ছিল।

কাশ্মীর প্রিন্সেসের শেষ অভিযাত্রার অপ্রতুল বিবরণী শেষ করি ক্যাপটেন জাতার, ডি-কুন্হা, পিমেণ্টা, ডি-সুজা, গ্লোরিয়া বেরী আর সেই এগারোজন যাত্রীর মহিমময় স্মৃতির প্রতি বিনীত অর্ঘ্যসহ, যে ষোলোটি বিবেকবান শান্তিপ্রিয় মানুষ নিহত হলেন,—শয়তানের অনুচরদের হাত দিয়ে হুইল-ওয়েলে টাইম বম্ব রাখিয়ে সুদর্শনা কাশ্মীর প্রিন্সেসের সঙ্গে যাঁদের হত্যা করা হল।

তাঁদের আত্মা শান্তি লাভ করুক। প্রকৃতই তাঁরা শহীদ ; যাঁরা সাহসিকতার সঙ্গে আত্মবলি দিয়েছেন মহত্তম কর্তব্য-সাধনায়—শান্তির উদ্দেশ্যে।

সেই ষোলোজনের উদ্দেশে এই বইখানি সবিনয়ে ও প্রীতিমুগ্ধ হৃদয়ে উৎসর্গীকৃত হল।

এ. এস. কারনিক

কর্মী আর যাত্রীরা

কর্মিবৃন্দ

ক্যাপটেন ডি· কে· জাতার—কমাণ্ডার
ক্যাপটেন এম. সি. দীক্ষিত—কো-পাইলট
শ্রী জে. সি. পাঠক—ফ্লাইট ন্যাভিগেটর
শ্রী কে· এফ· ডি-কুন্‌হা—ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়র
শ্রী সি. ডি-সুজা—ফ্লাইট পার্‌সর্
শ্রী জে. জে. পিমেণ্টা— সহকারী ফ্লাইট পার্‌সর্
কুমারী গ্লোরিয়া বেরী—এয়ার হোস্টেস
শ্রী এ· এস· কারনিক—এয়ারক্রাফ্‌ট্ মেন্‌টেনেন্স ইঞ্জিনীয়র

যাত্রিবৃন্দ

ডক্টর ফ্রেড্রিক জেনসেন······অস্ট্রিয়ান্ সংবাদদাতা
শ্রী জের্‌মি স্ট্রাস্······পোলিশ সংবাদদাতা
শ্রী ভন্ পিঙ ফুঙ······ভিয়েৎমিন অফিসার
শ্রী সিহ্ চিহ্ আং······চীনা প্রতিনিধি
শ্রী লি চাও-চি··· ··· ঐ
শ্রী চুং পু-য়ান্··· ··· ঐ
শ্রী চেন্ সেন্-টু··· ··· ঐ
শ্রী ওয়াং সো-মী··· ··· ঐ
শ্রী তু হুং··· ··· ঐ
শ্রী লী পিঙ··· ··· ঐ
শ্রী হাও ফেন্-কো ··· ঐ

এক রাজতনয়ার জন্ম ও মৃত্যু

'হাঙরেরা আপনাদের রেহাই দিল কী করে?'—নাতুনা দ্বীপ থেকে মালবাহী জাহাজ 'তাইপে'তে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে প্রথমে এই প্রশ্নই করেন আমাদের। তারপরও আবার এইচ. এম্. এস্. ভ্যাম্পায়ার-এর আলোচনায় দেখেছি, ওঁদের এক অফিসার বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছেন, 'কী করে যে হাঙরের মুখ থেকে বেঁচে এলেন, এটাই আশ্চর্য! আর হাঙরেরা হিংস্রতায় বারাকুডার কাছে ছেলেমানুষ। এরা হাঙরদেরও ভয় পাইয়ে দেয়…'

মনে আছে শুকনো হাসি হাসতে হয়েছিল আমাকে।

যে দক্ষিণ চীন সাগরে বেদনাদায়ক আট ঘণ্টা আমাদের কাটাতে হয়েছিল সে এক ভয়াবহতার লীলাভূমি। অপ্রত্যাশিত ঝড়ে নৌকা বিপর্যস্ত হয়। এই ভ্রূকুটির আড়ালে নরখাদক হাঙর আর বারাকুডার বিচরণ। মাথার ওপরে আকাশকে দেখে মনে হয় যে সেখানে এমন প্রতারণা নেই, কিন্তু সহসা যে কখন ঝড়-ঝঞ্ঝা এসে পড়বে, কেউ বলতে পারে না।

'কাশ্মীর প্রিন্সেস'-এর ভগ্নাবশেষ সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনার সময়কার ছবিগুলি যখনি ভালো করে দেখি তখন সবচেয়ে আতঙ্ক জাগায় দৈত্যকায় সেই হাঙরটার ছবি, বিরাট হুকের মুখে তাকে জল থেকে তুলে আনা হচ্ছে। শিরদাঁড়া পর্যন্ত কেঁপে ওঠে, যখনি ভাবি, এই হাঙরটা কিংবা এর মতো অন্য সব দানবেরা আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তেমনি চমক জাগায় অন্য ছবিগুলোও। 'ফিউজীলেজ' (যেখানে যাত্রী ও কর্মীদের আসন থাকে)

ভেঙে গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কঠিন ইস্পাত ও মিশ্রিত অ্যালুমিনিয়ামের অংশগুলো ভেঙে দুমড়ে জ্বলে গেছে। যা এক সময়ে নির্মাণশিল্পের সেরা নিদর্শন ছিল তা একতাল ধাতুর পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। অথচ তিনটি ভঙ্গুর মানুষ অল্প আঘাত নিয়ে বেঁচে ফিরে এসেছে।

অবশ্য এ গল্প বলতে হলে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হয়। সম্ভবত, আমার নিজের আর প্রিন্সেসের পরিচিতি দিয়ে শুরু করা উচিত।

আমার নাম অনন্ত শ্রীধর কারনিক। কাশ্মীর প্রিন্সেস যখন ধ্বংস হল, তখন আমার বয়স তিরিশ বছর। আমার পেশা, এয়ারক্রাফ্‌ট মেনটেনেন্স ইঞ্জিনীয়র, বা, এ. এম্. ই.; আমি আমাদের জাতীয় এয়ারলাইন এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালে কাজ করি।

আমরা এ. এম্. ই-রা পোতাশ্রয়ের মাটি ছেড়ে বড়ো একটা উঠি না। আসলে, আমরা বিমান-চালক নই; আর তাই কিছু লোক আমাদের একটু নিচু নজরে দেখে থাকেন। কিন্তু সত্যিকারের ভালো পাইলটেরা, স্বর্গত বন্ধুবর ক্যাপটেন জাতারের মতো, বিশ্বাস করেন, তুচ্ছ এই সাদামাটা গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ররাই নির্বিঘ্ন আর নির্দিষ্ট আকাশ-চারণ সম্ভব করেন। চিরকালই আমি মনে করে এসেছি যে আকাশপথ নিরঙ্কুশ রাখার ব্যাপারে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়রদের কাজ অশেষ গুরুত্বের। মনে করতে পারেন, আমরা হলাম ডাক্তার, অথবা বরং আমাদের ধাত্রী মনে করতে পারেন,—বিমানখানি হল আমাদের শিশু। আকাশে ওঠার ছাড়পত্র দেবার আগে দায়িত্বে অর্পিত বিমানগুলি নিষ্ঠাসহকারে বারবার পর্যবেক্ষণ করে থাকি আমরা, প্রয়োজন অনুসারে সংস্কার সংশোধন করি। আমরা গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়র, অথচ স্থায়িভাবে মাটিতে থাকা চলে না। প্রায়ই আকাশ-বিহারে বার হতে হয়। অবশ্য প্রমোদ-ভ্রমণে নয়; কর্মোপলক্ষ্যে। ধরাবাঁধা যে বিমানযাত্রা চলে তার অতিরিক্ত কোনো যাত্রা (চার্টার) স্থির হলেই ওঁরা একজন এ. এম্. ইকে অর্থাৎ

আমাদের কাউকে সঙ্গে নেন ; আর এগারোই এপ্রিল (১৯৫৫ সালের) বিকেলে সেই প্রথা অনুসারে হতভাগিনী 'কাশ্মীর প্রিন্সেসে'র সঙ্গে নিয়তি আমাকে যুক্ত করে দিল।

নাম 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' হলেও জন্ম তার সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায়। ইন্দ্রপুরী হলিউডের প্রায় গা ঘেঁষে বিখ্যাত বারব্যাঙ্ক শহর। দুটি কারণে জগৎজোড়া তার খ্যাতি ; এক হল, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের বারব্যাঙ্ক স্টুডিও, আর অপর কারণ, লক্‌হীডের বিমান নির্মাণের কারখানায় তৈরী কন্‌স্‌টেলেশন ও সুপার-কন্‌স্‌টেলেশন বিমান।

একটিমাত্র কন্‌স্‌টেলেশন বিমান প্রস্তুত হতে আঠারো মাসের পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। শত শত বিমান ডিজাইনার, ড্রাফট্‌স্‌মেন, ইঞ্জিনীয়র, মেকানিক, ওয়েলডার, ইলেক্‌ট্রিশিয়ান এবং অন্য দক্ষ কারিগর, মহিলা ও পুরুষের স্বেদাক্ত শ্রমের ফলে সম্ভব করেছে এই সুচারুরূপিণীকে। নির্মাতাদের ক্রমিক নম্বর ২৬৬৬ লক্‌হীড্‌ কন্‌স্‌টেলেশন এল্‌-৭৪৯এ। রেজিস্ট্রেশন চিহ্ন ভিটি-ডি. ই. পি., আর রহস্যমধুর এই নাম,—'কাশ্মীর প্রিন্সেস'—দিলেন এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টার-ন্যাশনাল বিমানখানি ক্রয় করার সময়।

এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের আন্তর্মহাদেশীয় আকাশপথের বাহনরূপে ক্যালিফোর্নিয়ার লক্‌হীড্‌ প্ল্যাণ্ট থেকে ওঁদের একখানি সুপার-কন্‌স্‌টেলেশন আনবার জন্যে যে ইঞ্জিনীয়র ও চালকের দল গিয়েছিল আমিও তাদের দলে ছিলাম।

তাই যখনি আমি কাশ্মীর প্রিন্সেসের কথা ভাবি তখনি ওর জন্মভূমির ছবি আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। লক্‌হীডের সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠান,—৩৮০০০ মহিলা আর পুরুষ কন্‌স্‌টেলেশন ও সুপার-কন্‌স্‌টেলেশন তৈরির জন্যে কাজ করছেন। আমার মনে পড়ে সেই জটিল আর কৌশলী পদ্ধতির কথা যার মধ্যে আঠারো মাস কাটানোর পরই কাশ্মীর প্রিন্সেসের মতো একখানি বিমান অ্যাসেম্‌ব্লি লাইন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

একান্তে সংরক্ষিত লক্‌হীডের গবেষণাগারের কথাও আমার মনে পড়ে, যেখানে রিসার্চ ইঞ্জিনীয়র ব্যতীত আর কারো প্রবেশ-অধিকার নেই। সেখানে ঘরের সমান বড়ো একখানি বিশালকায় পাখা ঘুরে চলেছে প্রবলগতি বাতাস সৃষ্টি করার জন্যে। সেই দ্রুতগতি বায়ুস্রোতের মুখে পরিকল্পিত বিমানের ছোট একখানি মডেল রাখা হয়। বিবিধ কৃত্রিম আকাশ-চারণের অবস্থায় ওই মডেলের গতিবিধি ইঞ্জিনীয়ররা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসরণ করেন। যথেষ্ট পরিমাণ হিসেবের অঙ্ক ডিজাইন-ইঞ্জিনীয়রদের কাছে পাঠাতে ছ-মাসের বেশী সময়ও প্রয়োজন হতে পারে। বিমানের মডেল নিয়ে এই সব মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও সব সময়েই প্রায় বিমানের অভিজ্ঞতা-লব্ধ নতুন সমস্যাবলী দেখা দেয়। সে সবের খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে সমাধান নির্ণয় করতে হয়। এমন সমস্যার অনবরতই উদ্ভব হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এয়ার-লাইনকে সমাধান পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীর এয়ার-লাইনগুলিকে বিজ্ঞাপিত করা হয়ে থাকে। এরই নাম, 'সার্‌ভিস্‌ আফ্‌টার সেলস্‌।'

ছশো জন বিমান-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়র ড্রইং বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর অভিনিবেশে সদা তৎপর। স্লাইডরুলে অঙ্ক কষছেন আর বিভিন্ন অংশের বিশদ নির্দেশনামা তৈরী করে পাঠাচ্ছেন—সেই সব অংশ একত্রিত করে সৃষ্টি হবে বিলাসসম্ভব লক্ষ-ডলার এয়ার-লাইনার।

এই সৃষ্টির কাজে মহিলারাও একটি বেশ বড়ো অংশ হাতে নিয়েছেন। বেশীর ভাগ স্টেনোগ্রাফার, সেক্রেটারি আর অফিস কর্মচারিণী হিসেবে তাঁরা তো আছেনই, তা ছাড়া অনেক মহিলা ছোট ছোট ট্রাক্‌শন্‌ ইউনিটের সাহায্যে এরোপ্লেনের বিশেষ বিশেষ অংশ বিভিন্ন অ্যাসেম্‌ব্লি প্ল্যান্টে পৌঁছে দিয়ে যান। কতগুলি ট্রাক্‌শন্‌ ইউনিটে সাইডকার লাগানো—স্কুটারের মতো দেখতে। হঠাৎ হয়তো আপনি দেখবেন একটি ইউনিট হু হু করে আপনার পাশ দিয়ে ছুটে গেল,

কেশদাম পাছে বিপর্যস্ত হয় তাই চালিকার মাথায় জড়ানো রঙিন রুমাল।

ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগটি তো প্রায় মেয়েদেরই দখলে। সিল্যুট-করা ডায়গ্রামের ওপরে প্রয়োজন-অনুরূপ দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের তার এঁরা এরোপ্লেনের গায়ে গোছা করে রাখেন। লক্‌হীডে রিবেট করা, ধাতু কাটা বা অন্য অনেক কায়িক শ্রমের কাজও মেয়েদের করতে দেখেছি আমার মনে পড়ে। লক্‌হীড ক্যাণ্টিনের অর্ধেকের বেশী কর্মীই মহিলা।

জটিল যন্ত্রে কাজ করতে হলে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় অংশের সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাকা চাই। অংশ সন্নিবেশের সময়ে সামান্য ত্রুটি সময়ে সময়ে হাজার টাকা ক্ষতির কারণ হতে পারে, কিংবা বাঁধাধরা যাত্রার সময়কে বিলম্বিত করতে পারে। এ অবস্থা নিবারণের জন্যে কন্‌স্‌টেলেশনে কাজের উপযুক্ত নির্বাচিত কর্মীদের বিশেষ শিক্ষা নিতে হয়। অনেক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করে একটি সুব্যবস্থিত শিক্ষা-কেন্দ্র লক্‌হীড পরিচালনা করছেন। শিক্ষাকে আরো কার্যকরী করার জন্যে সরল ছোট মডেল বা অনেক সময়ে প্রমাণ মাপের যন্ত্রের মডেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডক (এভারেট) আয়ার-এর একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। প্রপেলর ডায়াগ্রামের একটি সুইচ নির্দেশ করে তিনি বলছিলেন, "প্রপেলর ব্যবস্থার এটাই হল ক্যাডিলাক বিশেষত্ব...।" নিজের ক্যাডিলাকটিকে তিনি মহামূল্যবান সম্পত্তি মনে করতেন।

দুর্ঘটনার কথা লিখতে বসে এইসব কথা আমার মনে পড়ছে, কারণ ওই ছিল কাশ্মীর প্রিন্সেসের জন্মভূমি, আর জন্মবৃত্তান্ত। নিউ ইয়র্ক আর লণ্ডন হয়ে সে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ভারতে এসে পৌঁছল। চার বছর এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের কাজে সে প্রায় তিরিশ লক্ষ মাইল উড়ে বেড়িয়েছে, এগারো হাজার একশো তেষট্টি ঘণ্টায়। তার রুপালী পাখায় সে হাজার হাজার ভারতীয় ও বিদেশীকে বয়েছে. ছাত্র

বৈজ্ঞানিক ব্যবসাদার সরকারী কর্মচারী কারিগর লেখক শিল্পী রাজনীতি-বিদ্—সবাইকে। আর একাধিক বার বিশ্ববাসীর শান্তি ও একতার অভিযাত্রা-পথে আমাদের প্রিয় প্রধান মন্ত্রীকেও সে বহন করেছে। যারা 'হুইল্ ওয়েল্'এ সেই মারাত্মক টাইম বম্ব রেখেছিল, তারা কেবল ভারতীয় কর্মী, চীনা, ভিয়েৎনামী, অস্ট্রিয়ান ও পোলিশ যাত্রীদের হত্যাকারী বলেই চিহ্নিত হবে না, হাজার হাজার আমেরিকানের নিপুণ হাতে গড়া, আমেরিকান বিমান-বিজ্ঞানের অপূর্ব একখানি নিদর্শনের ধ্বংসসাধনকারী বলেও অভিযুক্ত হবে।

কাশ্মীর প্রিন্সেসের সেই নিয়তিলাঞ্ছিত শেষ অভিযাত্রার একদিন মাত্র আগে আমায় জানানো হল যে জাকার্তা পর্যন্ত আমাকে ওর সঙ্গী হতে হবে। সংবাদে আমি বিশেষ খুশী হই নি, কারণ, এ বেশ শ্রমসাধ্য দূরপাল্লার যাত্রা। প্লেন ছাড়ার মিনিট খানেক আগে যে চিঠি আমি ডাকে দিয়েছিলাম তাতে ঐ কথাই লিখেছিলাম রেওয়াতে আমার বাগ্‌দত্তা কমলের কাছে। স্বভাবতই সে তখন আমার ভাবনার অনেকখানি অধিকার করে বসেছিল, কারণ তার পরের মাসেই আমাদের বিয়ের কথা। প্রকৃতপক্ষে কমলের মা আর দিদি এরোড্রোমেই আমার সঙ্গে দেখা করে ১৯শে মে তারিখ পাকা করে গেলেন। সত্যিই, সে যাত্রায় পা বাড়াতে মনে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু পরে, হংকংএ পৌঁছে বেশ উল্লসিত হয়ে উঠলাম। খবর পেলাম, বান্দুং সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে আমরা যাব, আর সেই দলে থাকবেন চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রীচৌ এন-লাই। বিশিষ্ট এক ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যে এবার উড়ছি, এমন একটা ধারণা মনে এল। তখন জানতাম না যে, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের লগ্নে পরিণত হবে এই অবসর।

বম্বে থেকে হংকং

দশই এপ্রিল, ১৯৫৫। বম্বের গ্রীষ্মের অপরাপর দিনের মতো সেদিনটাও সূর্যদীপ্ত; উজ্জ্বল তার উত্তাপ। সকাল-সকাল লাঞ্চ সেরে সাণ্টাক্রুজ এয়ারোড্রোমে এলাম। শুনলাম, কাশ্মীর প্রিন্সেস ছাড়তে ঘণ্টা দুয়েক দেরি হবে। বিধিবদ্ধ পর্যবেক্ষণ শেষ হয়ে ওঠে নি। আমি একটু মুষড়ে পড়লাম। পূর্বনির্দিষ্ট হিসাবমতো পরের দিন সন্ধ্যের শেষের দিকে জাকার্তা পেঁছে তার পরের সকালে জাকার্তা ত্যাগ করার কথা। বিলম্বের অর্থ হল, ভালোমত বিশ্রামের আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া। ব্যাপারটা আমাকেই বিশেষ করে বিঁধছিল, কারণ ব্যাঙ্ককে অন্য কর্মীরা বদল হলেও আমি জাকার্তা অবধি চললাম।

'টেক অফ-এর অল্প পরেই আমি 'কক্‌পিট্'-এ গেলাম। "কি হে কারনিক", কমাণ্ডার নীভস্ প্রশ্ন করলেন, "কদ্দূর যাচ্ছ? ব্যাঙ্কক বুঝি?"

"আহা তা যদি হত···" জবাব দিলাম, "আমাকে সেই জাকার্তা অবধিই যেতে হবে।"

"ভাগ্যবান পুরুষ তুমি! চায়নার প্রধান মন্ত্রী প্লেনে থাকবেন", কো-পাইলট গডবোলে জানাল। পুলকিত হয়েছিলাম কি না? দারুণ খুশী তখন হয়েছিলাম, বলা বাহুল্য।

কলকাতায় অল্প বিরতির পর ব্যাঙ্ককের পথে রওনা হওয়া গেল। যাত্রীরা তখন আসন সন্ধানে ব্যস্ত। এয়ার হোস্টেস তাঁর চিরাচরিত বিনয়ভাষণে অভ্যর্থনা শুরু করলেন, "আপনদোর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি কি? এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল স্বাগত জানাচ্ছে আপনাদের, কাশ্মীর প্রিন্সেসের আশ্রয়ে···" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ-সব আমার বহু পরিচিত।

তারপর, রানওয়ে পেরিয়ে আসতেই আবার তাঁর স্বর। এবার

লাইফ জ্যাকেট সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি। এও নিশ্চয়ই আমি কয়েক শ বার শুনেছি। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। কান না ফিরিয়েও তাঁর প্রতিটি কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। "আপনাদের মনোযোগ পেতে পারি কি? লাইফবোট ড্রিল উড়োজাহাজে একটি স্বাভাবিক রুটিন বলেই, জরুরী অবস্থায় জলে নামার নেহাতই অসম্ভাব্য পরিস্থিতিতে তৈরী থাকার জন্যে আমরা লাইফ জ্যাকেট ব্যবহারের পদ্ধতিটা আপনাদের দেখিয়ে দিতে চাই।"······তারপর ফ্লাইট পারসার দুজনে লাইফ জ্যাকেটের ব্যবহারের প্রদর্শনী শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এয়ার হোস্টেসের গুঞ্জন চলে :

"আপনার লাইফ জ্যাকেট আপনার হাতের কাছেই, অনায়াসে পরে নেওয়া যায়, আপনা-আপনি বাতাস ভরে যায় একটি 'টগল' ধরে টান দিলেই। মুখে করে ফাঁপিয়ে নেবার ব্যবস্থাও আছে। স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে প্লেন থেকে পুরোপুরি বাইরে যাওয়ার আগে জ্যাকেট ফুলিয়ে নেওয়া উচিত নয়···।" তারপর অভয়বাণী হয় : "এই প্রদর্শনী এক সাধারণ বিধিমাত্র" আর পরিশেষে "ধন্যবাদ"। অতঃপর লাউড স্পীকারের সুইচ বন্ধ করা হয়। ফ্লাইট পারসার জ্যাকেটগুলি তাকে তুলে রাখেন, আর আমি মনে মনে বলি, ভগবানকে ধন্যবাদ, এবার এ পর্ব চুকল, এখন ঘুমানো যাবে।

ব্যাঙ্ককে নামলাম এগারোই এপ্রিল ভোরে। ডনমুয়াং বিমানপোতের টারমিনাল বিল্ডিংএর বারান্দা দিয়ে রেস্টুরেণ্টের দিকে যাচ্ছিলাম। সুবেশ সুদর্শন ক্যাপটেন জাতার মৃদু হেসে আমায় দাঁড় করালেন। তাঁর ইউনিফর্মের দুই হাতে আর কাঁধে চারটি করে সোনালী স্ট্রাইপে তাঁকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। 'হ্যাঁ, এ এক কমাণ্ডার বটে!' মনে মনে বললাম আমি। শুনে ভারী খুশী হলাম যে তিনিই কাশ্মীর প্রিন্সেসকে ব্যাঙ্কক থেকে জাকার্তায় নিয়ে যাচ্ছেন। 'বিমানে সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন জাতার। 'নিখুঁত···' জানালাম আমি। তারপর রেস্টুরেণ্টের দিকে রওনা দিলাম।

প্রাতরাশের সময় কানে গেল, কে যেন ডাকছে, 'হ্যালো কারনিক', ফিরে দেখি আমাদের পুরানো বন্ধু, ক্যাপটেন দীক্ষিত। 'প্লেনেই দেখা হবে', বলে ত্বরিতপদে রেস্টুরেন্ট থেকে চলে গেলেন তিনি। আমি যখন প্লেনে ফিরলাম তখন দেখি ডি-কুন্‌হা তাঁর পর্যবেক্ষণের কাজ সবেমাত্র শেষ করেছেন। আমরা অভিনন্দন বিনিময় করলাম।

ব্যাঙ্কক থেকে হংকং যেতে চার ঘণ্টা লাগে। আমি বেশীর ভাগ সময়টাই যাত্রীদের কেবিনে ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিলাম। আবহাওয়া সুন্দর, প্লেনের অবস্থাও নির্দোষ আর কর্মীরা সবাই তাজা। অতএব এই সময়টুকুতে আর কক্‌পিটে হাজির হওয়ার কষ্ট স্বীকার করলাম না। সাধারণত কক্‌পিটে সবাই ইঞ্জিনীয়ারদের উপস্থিতি পছন্দ করে, কারণ হালকা কথায় বার্তায় কর্মীদের ক্লান্তি আর একঘেয়েমি অনেকটা কেটে যায়।

বিকালের দিকে হংকং পৌঁছানো গেল। বেশ উজ্জ্বল নির্মেঘ আবহাওয়া। জগৎ জুড়ে যত প্রতারক ঘাতক বিমানপোতাশ্রয় আছে হংকং এয়ার পোর্ট তার মধ্যে অন্যতম। ভালো আবহাওয়া এখানে ভগবানের আশীর্বাদ বিশেষ। কারণ উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে এই এয়ারোড্রোমটি। চারের তিনভাগ পাহাড়ে ঘেরা, বাকিটুকু সমুদ্রের দিকে মুক্ত। চালক কিংবা ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে স্বল্পতম অনবধানতার অবসর নেই। কণ্ট্রোল চালনায় এক ইঞ্চি বিচ্যুতি, ছোট্ট রানওয়ে স্পর্শ করার সময় সামান্যতম ত্রুটি, ইঞ্জিনের কাছে প্রত্যাশিত ব্যবহারে ন্যূনতম হেরফের—অবতরণ বা আরোহণ কালে এর কোনো একটা ঘটলেই সর্বনাশে শেষ হবে। হংকং এয়ারপোর্ট পাইলট আর ইঞ্জিনীয়ারের কাছে কিছু অতিরিক্ত দক্ষতা দাবি করে। হংকংএ ইতিমধ্যে বারকয়েক গিয়েছি বলে শঙ্কাসম্ভব সেই ল্যাণ্ডিং বা টেক্ অফ্-এর দৃশ্যে কোনো নতুনত্ব ছিল না কিন্তু রোমাঞ্চ তেমনি ছিল, ট্রাপিজের খেলা দেখার মতো এক উত্তেজনা।

হংকং ভারী মনোরম শহর,—পরিচ্ছন্ন আর আধুনিক। বিমানখানি

যখন একবার পোতাশ্রয়ের আকাশ ঘুরল, নীচের জলপথে দেখি বিবিধ আকৃতির ছুটে বেড়ানো মোটরবোটের ভিড়; আলস্যে মন্থর নোঙর-ফেলা জাহাজ আরামে ধীরে সুস্থে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে সকৌতুকে যেন এদের ছেলেমানুষী তাড়াহুড়ো দেখছে—ব্যস্তবাগীশ পিপীলিকার দিকে যেমন চোখে হাতিরা তাকিয়ে থাকে। এই দ্রুত সঞ্চরমাণ ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ে দূরে যাবার ত্বরায় উদ্বিগ্ন মোটর বোটগুলো অথবা অদ্ভুত অলস আচ্ছন্নদৃষ্টি সুবিপুল সাগরিকার প্রতি উদাসীন মনোভাব নিয়ে রাজকীয় চলনে ভেসে চলেছে প্রশস্ত পাল তুলে 'চীনা জাঙ্ক'। নীচের এ দৃশ্য নিমেষে সরে গেল, মনোহর হংকং পাহাড় দেখা দেয় সদ্যঃসুপ্তোত্থিতের মতো। অপরূপ প্রস্তর প্রতিমূর্তির ভঙ্গিমায় তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ শ্বেতশুভ্র বাড়িগুলি। বিচ্ছিন্ন এক-এক টুকরো মেঘ এখানে সেখানে তার শীর্ষদেশ স্পর্শ করে। কোথাও বা ক্ষণকাল দাঁড়ায়, তারপর এগিয়ে যায়। এ দেখে আমার এক রুচিবাগীশ খুঁতখুঁতে ভদ্রমহিলার হ্যাট পছন্দ করার কথা মনে পড়ল। এই সব মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের আমেজ মনে একটু যেই লাগে, দ্রুতগতি প্লেন নাড়া দিয়ে তখনই যেন প্রাগ্-অবরোহণ পর্বের কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। প্লেনের ডানা যেন না বেঁকে যায়, তাহলেই পাথরে ধাক্কা খাবে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়। সজোরে চেয়ারের পাশ চেপে ধরে হাতগুলো। নীচে দিয়ে তখন অতিদ্রুত সরে যায় গতিমুখর পথ, সবেগে চলা মোটরকার আর বাস আর অগণিত মানুষ। সহসা ধূসর ঝকঝকে রানওয়ে দেখা দেয়, প্লেনের নীচে সরে সরে চলেছে। শ-খানেক গজ যাবার পরই মনে স্বতঃই এক কামনা জাগতে থাকে, প্লেন তাড়াতাড়ি নেমে পড়ুক, কারণ বাকি রানওয়েটুকু যেন বেজায় ছোট আর সামনের উঁচু পাহাড়টা বেজায় কাছে বোধ হতে থাকে। তারপর বিমান মাটি স্পর্শ করে আর মন্থর হয়। যাত্রী আর কর্মীদের বেশ কিছু স্বস্তির নিশ্বাস কর্ণগোচর হয়। বিশাল বিমানখানি গর্বভরে পার্কিংএর জায়গায় গড়িয়ে আসে বিজয়ীর

ভঙ্গীতে। তখন উঁচু নীল পাহাড়গুলো মিটমিট করে হাসতে থাকে, যেন বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে : প্লেনের ওই ক্ষুদে মানুষগুলোকে কী ভয়ই না দেখানো গেছে।

যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর কাশ্মীর প্রিন্সেসের কর্মীরা বাইরে আসে আর উদ্ধত কঠোর পাহাড়গুলোকে দেখে আর যেন বলে : 'থাক, আমাদের আর রুখে রাখতে হচ্ছে না।'

নির্ধারিত যাত্রাটুকুর সমাপ্তি হল বটে কিন্তু তখনও আমাদের কিংবা কাশ্মীর প্রিন্সেসের পথের অবসান হয় নি। অনতিবিলম্বে চীনা প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে জাকার্তা অভিমুখে রওনা হওয়ার কথা।

সতেজে আমি কাজে লেগে পড়ি, বিমানের শতেক যান্ত্রিক খুঁটিনাটি পরীক্ষায়। আমি বেশ গর্ববোধ করলাম কাশ্মীর প্রিন্সেসের চমৎকার ব্যবহারে। বম্বে থেকে হংকং পর্যন্ত উড়ে এসেছে কোনো ত্রুটির লেশমাত্র না জাগিয়ে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আকাশযাত্রার কঠোরতম দায়িত্ব বহন করতে হবে ইঞ্জিনীয়ারদের। পাহাড়ের অভিমুখে সামনের অতি অল্প পরিসর রানওয়ে দিয়ে টেক্ অফ্ করতে হবে। ইঞ্জিনের শক্তি আর পাইলটের দক্ষতার এ এক অগ্নিপরীক্ষা স্বরূপ।

প্লেন থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হংকং এয়ারক্রাফ্ট্ করপোরেশনের একদল কর্মী, তাদের বেশীর ভাগই স্থানীয় চীনা, ঘিরে এল। কেউ ইঞ্জিন পরীক্ষায়, কেউ তেলের পরিমাণ দেখতে, কেউ বা আবার তেল নেওয়ার কাজে সাহায্য করতে। বেশীর ভাগই নিরত হল ইঞ্জিন থেকে ছিটিয়ে আসা তেল মুছে ফেলতে। লাল আর হলদে রং ভরা 'পেট্রল বওসর' প্লেনের সামনে এসে দাঁড়াল। নিখুঁত পোশাকপরা চীনা কর্মীরা পাইপগুলি বিছিয়ে দিয়ে অতি সতর্ক বিধিবদ্ধতায় কাশ্মীর প্রিন্সেসের জাকার্তা পর্যন্ত অবিরাম যাত্রার উপযোগী তেল ভরার কাজ শুরু করল।

ডি কুন্হা পাখার ওপর দাঁড়িয়ে তেলভরা তদারকি করলেন। তাই আমাদের দুজনকে মধ্যাহ্ন ভোজনটা বাদ দিতে হল।

যে সময়ে আমি ওয়েল-লিক্ ইত্যাদির জন্যে ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করছিলাম আর ডি-কুন্‌হা ছিলেন তেল ভরার তদারকে ব্যস্ত সেই অবসরে অন্য কর্মীরা এয়ারপোর্টের রেস্টুরেণ্টে তাদের লাঞ্চ সেরে এসেছে।

কর্মীদের জন্যে সব বিমানপোতাশ্রয়ের রেস্টুরেণ্টেই বিশেষ টেবিল রিজার্ভ করা থাকে, যাতে কৌতূহলী যাত্রী বা অচেনা লোকেদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিরিবিলিতে ভোজনপর্বটা সমাধা করতে পারা যায়। সারা যাত্রাপথ তাদের সজাগ থাকতে হবে, তাই এই আয়োজন।

এগারোই এপ্রিল বিকেলে হংকং পোতাশ্রয় থেকে কাশ্মীর প্রিন্সেসই একমাত্র প্লেন, চার্টার্ড ফ্লাইট এগারোজন যাত্রী নিয়ে যাত্রা করার কথা। তাই ওখানের রেস্টুরেণ্ট মোটেই জনাকীর্ণ ছিল না। ডেলিগেটরা সবেমাত্র এসে পৌঁছেছেন। ডিপ্লোম্যাটদের গাম্ভীর্য তাঁদের ব্যবহারে সুপরিস্ফুট। প্রত্যেকের হাতেই স্ফীতকলেবর ব্রীফকেস, স্বভাবতই মূল্যবান নথিপত্রে বোঝাই। যদিও সকলেই রাজনৈতিকদের মতো ভদ্র আর গম্ভীর, পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে ভূষিত তবু কারোরই চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইএর মতো মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারা বা প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল না। পূর্বতন বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ছিল যে এই চার্টার্ড ফ্লাইটে হিজ্ এক্সেলেন্সি চৌ এন-লাই যাত্রী হবেন। কাশ্মীর প্রিন্সেসের কর্মচারীরা আসন্নপ্রায় যাত্রার প্রস্তুতির আলোচনায় ব্যস্ত থাকলেও চীনা মন্ত্রী-প্রধানের ওই বিশেষ অনুপস্থিতি লক্ষ্য না করে পারল না। কিন্তু ও বিষয় আর আলোচিত হয় নি কারণ প্লেনের আরোহীদের সম্পর্কে অযথা কথাবার্তা না কওয়ার সতর্কতায় এয়ার-লাইনে কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের কাজ হল, যেই আসুক তাকে অভীষ্টে পৌঁছে দেওয়া।

চমৎকার খাবার পরিবেশিত হল আর সেই সঙ্গে কর্মীদের মন সমাগতপ্রায় যাত্রার সুখানুভূতির দিকে ফিরল। সুন্দর আবহাওয়ায় সুখযাত্রার আশ্বাস ছিল। সারা বিশ্ব যেন সুছন্দে গাঁথা···কিন্তু ছন্দ ছিল কি ?

ঠিক তখনি একটি যুবক টেবিল পর্যন্ত এল, চেয়ার টেনে বেশ আরাম করে নাটকীয় চমক দিয়ে বসল। সে আত্মপরিচয় দেবার বা অনাহূত এই দলে এসে বসার অনুমতি চাওয়ার দরকার মনে করল না। যেন সীটখানা তার জন্যেই রিজার্ভ করা এমন তার বেপরোয়া ভাব, কিংবা সীটখানা যারই হোক না তার কিছু এসে যায় না। চেহারা দেখে তাকে পশ্চিমের (ওয়েস্টার্নার) লোক বলে মনে হয়। কর্মীদের প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখেই সে ঠোঁটে হাসি টেনে বিশিষ্ট আমেরিকান বাচন-ভঙ্গীতে শুধোল, আপনারা বান্দুং সম্মেলনে একদল চীনা প্রতিনিধিকে নিয়ে যাচ্ছেন, না? অপরিচিত লোকটির এই ধরনের অনধিকারচর্চায় কর্মীরা বেশ বিব্রত বোধ করলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে সকলেই তার এই সীমালঙ্ঘনকে তিরস্কার জানাল। প্রথম প্রশ্নের সে কোনো জবাব পেল না। প্রচ্ছন্ন বিরূপতাকে লক্ষ্য করার পক্ষে তার গায়ের চামড়া কিছু পুরু। ক্যাপটেন দীক্ষিতের দিকে ফিরে সে বলতে লাগল, "চিঙ্কগুলো বেজায় চাপা, তাই না? মুখটিও খোলে না। ঠিক কি না?" বলে সে হাসল।

চীনাদের 'চিঙ্ক' বলে উল্লেখ করা ক্যাপটেন দীক্ষিত পছন্দ করলেন না। বাইরে প্রশান্ত থাকলেও, ভিতরে ভিতরে উনি জ্বলছিলেন, বললেন, 'জানি না।'

ক্যাপটেন দীক্ষিতের অবজ্ঞায় কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে সে নেভিগেটর পাঠকের দিকে ফিরল, 'আপনারা বোধহয় খুব শিগগিরই উড়বেন?' 'ঘণ্টাখানেক বোধহয়', কোনো গোপন তত্ত্ব ফাঁস করছেন না, এই বিশ্বাস নিয়েই হালকাভাবে নেভিগেটর জবাব দিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল লোকটার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়েছিল। সে তার অবিরাম প্রশ্নবাণ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে যেন বদ্ধপরিকর।

'কখন জাকার্তা পৌঁছচ্ছেন?' সে বেহায়ার মতো প্রশ্ন করলে।

এই অবাঞ্ছিত প্রশ্নগুলো যতই বিরক্তিজনক হোক, কর্মীরা অভদ্র

হতে পারেন না। এই অনুসারে পাঠক ভাসাভাসা জবাব দিলেন, 'সন্ধ্যের দিকে কোনো এক সময়ে…' উত্তর দিয়েই উনি ক্যাপটেন জাতারের দিকে চাইলেন। তাঁর চোখে নিশ্চিত নির্দেশ : এই ভুঁইফোড় লোকটাকে আর কোনো খবর দেওয়া চলবে না।

এই সময়ে এয়ার-ইণ্ডিয়ার একদল কর্মচারী ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট থেকে ক্যাপটেন জাতারকে এসে খবর দিলেন, যাত্রীদের জিনিসপত্র তোলা, তেলভরা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ শেষ। যাত্রার জন্য সব তৈরী। 'বেশ শিগগির হয়ে গেল তো!' সন্তোষ প্রকাশ করলেন ক্যাপটেন জাতার। ট্রাফিক কর্মীটি জানাল, প্রতিনিধিরা ডিপ্লোম্যাট বলে তাঁদের কাস্টমস্ পরীক্ষাদি নেই।'

ট্রাফিক কর্মচারীটির বিজ্ঞপ্তি শুনেই আগন্তুকটি চেয়ার ছেড়ে ত্বরিতে উঠে পড়ল আর যেমন সহসা আবির্ভূত হয়েছিল তেমনি নিমেষে রেস্টুরেণ্ট থেকে অন্তর্হিত হল। রেস্টুরেণ্টের দ্বারপথে অপস্রিয়মাণ অপরিচিত লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, 'বোধহয় কোনো কৌতূহলী কাগজের লোক, কী বিরক্তিকর…।' শুনে দীক্ষিত মন্তব্য করলেন, 'লোকটাকে মোটের ওপর আমার ভালো লাগে নি।' ক্যাপটেন জাতার বললেন, 'আমারও লাগে নি। দীক্ষিত, তুমি এবার গিয়ে কক্‌পিটের প্রাথমিক পরীক্ষাগুলো সেরে নাও…আর পাঠক চলো আমরা এ. টি. সি. (এয়ার ট্রাফিক কণ্ট্রোল) থেকে ব্রীফ আর আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিগুলো নিয়ে আসি। সম্ভবত আকাশ পরিষ্কারই থাকবে।'

এই কথার পর ক্যাপটেন জাতার অন্য কর্মীদের সঙ্গে উঠলেন। ক্যাপটেন জাতার আর নেভিগেটর পাঠক এয়ার ট্রাফিক কণ্ট্রোল বিল্ডিংএ গেলেন। ক্যাপটেন দীক্ষিত, গ্লোরিয়া বেরী, ডি-সুজা আর পিমেণ্টো বিমানে এলেন। দীক্ষিত কক্‌পিটে ওড়ার আগের পরীক্ষা-গুলো সারতে বসলেন। গ্লোরিয়া, ডি-সুজা আর পিমেণ্টো কেবিনে এসে গ্যালি কম্পার্টমেণ্টে যথেষ্ট খাবার আছে কি না, আর ভেতরে সব ব্যবস্থা যথাযথ আছে কি না পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

বিমানে বিধিবদ্ধ পর্যবেক্ষণ যখন চলছিল তখন এয়ার হোস্টেস-এর কাছ থেকে একজন খবর নিয়ে এল, কেবিনে আমারই স্যুটকেসের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সম্ভবত হংকং-এ প্লেন থেকে যাঁরা নেমে গেছেন তাঁদের মালপত্রের সঙ্গে ভুলবশত নামানো হয়ে গেছে। আমার কাজ ছেড়ে যাওয়ার সম্ভব ছিল না, তাই অন্য একজনকে আমার স্যুটকেসটি অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ করলাম আর নির্বিঘ্নে বিমান পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গেলাম। কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় হঠাৎ এয়ার-ইণ্ডিয়ার এক কর্মচারী আমার কাজে বাধা দিয়ে বললেন, 'কারনিক, আশেপাশের অজ্ঞাতকুলশীলদের ওপর একটু নজর রেখো। দেখো, চৈনিক সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, 'স্যাবোটেজের' সম্ভাবনা আছে।' আমি বললাম, 'সে কি! আমার পক্ষে তা সম্ভব কী করে, আমি তো নিজেই হংকং-এ অপরিচিত। এ হল পুলিশ বা সিকিউরিটির (নিরাপত্তা বিভাগ) কাজ।' আর বার্তালাপ হল না। হাতের কাজ শেষ করেছি এমন সময় ডি-কুন্হা এসে তাঁর বিহ্বল দৃষ্টি আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন যে তাঁরও স্যুটকেস অন্তর্হিত, তার খোঁজে তিনিও চলেছেন টারমিনাল বিল্ডিংয়ে। আমিও তাঁর সঙ্গ নিলাম কারণ ওখানের 'টয়েলেটে' যাওয়া আমারও প্রয়োজন। প্রবেশ করার মুখে আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। দশ মিনিট পরে ফিরে এসে দেখি কর্মী আর যাত্রীরা নিজেদের আসনে রয়েছেন। তাড়াতাড়ি বিমানে উঠে পড়লাম। আর সীটে বসার আগে দেখি আমার স্যুটকেসটি যথাস্থানেই আছে। যেমন রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হয়েছিল তেমনি ভাবেই ফিরে এসেছে। পিছনের কেবিন দিয়ে আসার সময় এগারোজন যাত্রীকেই এক নজরে দেখতে পেয়েছিলাম আর লক্ষ্য করেছিলাম তাঁদের অধিকাংশই চৈনিক, শুধু দু-একজন ইউরোপীয়। সামনের কেবিনটি সম্পূর্ণ শূন্য থাকায়, আমি সেখানে বসাই স্থির করলাম, যাতে গত রাত্রের ঘুমটা পুষিয়ে নিতে পারি। কনস্টেলেশনটি তখন 'টেক অফ'-এর পয়েন্টের দিকে গড়িয়ে চলেছে। লাউডস্পীকারে গ্লোরিয়া বেরীর

সুকণ্ঠ বেজে উঠল। এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি বিধিবদ্ধ বটে কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিরক্তিজনক। তাঁর আন্তরিক প্রাণবন্ত স্বরে তুচ্ছ বিবরণগুলো নাটকীয় অর্থদ্যোতনা পায়।

'লেডিস্ অ্যাণ্ড জেণ্টল্‌মেন' বলার প্রচলিত বিধি ছেড়ে তিনি বললেন, "গুড আফটারনূন্, জেণ্টলমেন", কারণ সেই প্লেনে তিনিই একমাত্র মহিলাযাত্রী। "এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল্ কাশ্মীর প্রিন্সেসের আশ্রয়ে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে। স্থানীয় সময় ১২'০২ ; আর আমরা জাকার্তা অভিমুখে যাবার জন্য যাত্রা করেছি। যাত্রীরা দয়া করে সীট-বেল্ট-গুলো এঁটে নিন আর ধূমপান নিষেধের বিজ্ঞাপন অনুসরণ করুন..." যন্ত্রের মতো সীট-বেল্টগুলো ঠিক করে নিলাম। গ্লোরিয়া বলে চললেন যে জাকার্তার দূরত্ব ১৯৬০ মাইল ; প্রায় সাত ঘণ্টা তিরিশ মিনিটে এই পথ অতিক্রম করা হবে, আমরা ১৮,০০০ ফিট উচ্চতায় বাহিত হব আর বৈকালিক চা-পানের আয়োজন বিমানেই হবে। তারপরের কথাগুলোর বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তির অংশ কিন্তু আজো আমার কানে বাজছে......

"আপনাদের ফ্লাইট পারসার, ডি-সুজা আর পিমেণ্টো আর আপনাদের এয়ার হোস্টেস্, গ্লোরিয়া বেরী পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকবেন। আহারাদি বা অন্য যে কোনো প্রয়োজনে তাঁদের ডেকে নিতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না। ক্যাপটেন জাতার আর তাঁর কর্মীদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাই, অভীষ্ট পথের যাত্রা সুখপ্রদ হোক। ধন্যবাদ।" যখন এই কথাগুলো উচ্চারণ করছিলেন তখন সদাহাস্যমুখী গ্লোরিয়া কি কোনো আশঙ্কার স্বল্পতম পূর্বাভাস পেয়েছিলেন, ঘোষণা উচ্চারণের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যে তিনি নিজে আর তাঁর রক্ষণাধীন যাত্রীরা, ক্যাপ্টেন জাতার, আর তাঁর সঙ্গী কর্মচারীরা সর্বনাশের কবলে পড়বে ? একদা যাঁকে কাশ্মীর প্রিন্সেস বলে ভুল করা হয়েছিল, সেই গ্লোরিয়া কি জানতেন যে ঐ নামাঙ্কিত বিমানের সাথী হয়েই তিনি অন্তিমে পৌঁছাবেন ?

সিঙ্গাপুরের সাংবাদিকরা গ্লোরিয়াকে কাশ্মীর প্রিন্সেস অভিষিক্ত করেছিল। ১৯৫৪-র ৬ই জুলাই, এক বছরের অনধিক কাল আগে এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সিঙ্গাপুরের আকাশপথ চারণ আরম্ভ করে। সেই আনুষ্ঠানিক আরম্ভ স্থানীয় কাগজের একটি বিশেষ সংবাদ বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। সংবাদে আরো জানানো হয়েছিল যে প্রথম যাত্রাটি করবে কাশ্মীর প্রিন্সেস। বিমানটির প্রতীক্ষায় এক বিশাল জনতা এয়ার পোর্টে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু লোকের প্রত্যাশা ছিল শুধু কাশ্মীর প্রিন্সেস নয়, সেই সঙ্গে কাশ্মীরের এক রাজতনয়ারও দর্শন পাওয়া যাবে।

গ্রীষ্মমণ্ডলের উজ্জ্বল সূর্যালোকে কন্স্টেলেশন বিমানখানি যখন এসে দাঁড়াল আর সব যাত্রীরা নেমে আসলেন, সুন্দরী গ্লোরিয়া মৃদু হাসিতে ভরা মুখখানি নিয়ে রাজকীয় কায়দায় বেরিয়ে এলেন। জনতা তাঁকেই কাশ্মীর প্রিন্সেস বলে অভিনন্দন জানাল। নিউজ ক্যামেরা-ম্যানদের ক্যামেরা তৎপর হল। আর তাঁর ছবি 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' শিরোনামা অঙ্কিত হয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হল। তারপরও ডাকনামটা টিকে রইল সগৌরবে।

সব এয়ার হোস্টেসেরাই পরিশ্রমী আর নীতি-অনুগ বলে খ্যাতি আছে। ত্রিবিংশতি বয়স্কা গ্লোরিয়া তাঁর বৃত্তিকে ভালোবাসতেন। সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা দেখে বেড়ানোয় উত্তেজনা আর আনন্দ আছে। সুবিশাল সুন্দর শহর, টাওয়ার অফ লণ্ডন, ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে, এলফিল টাওয়ারের মতো ঐতিহাসিক স্মৃতিবাহন, গ্রীস তার গৌরবের কালে যা ছিল, রোম যা ছিল তার ঐশ্বর্যে। এ সবেই গ্লোরিয়ার ভীষণ উল্লাস আর আরো অনেক দেখার অভিলাষ। তিনি মনে করতেন এ এক অমূল্য শিক্ষা। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, চীন ইত্যাদি বিশ্বের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীর—ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রতারকা—এমনি বিভিন্ন জীবনধারার লোকের সঙ্গী হওয়া আর পরিচয় লাভ করা মনের গণ্ডি ভেঙে জ্ঞানের সীমাকে বিস্তৃত করে দেয়।

ভ্রমণই এক সুশিক্ষা, কলেজের যে শিক্ষা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি, তার চেয়েও অনেক মূল্যবান। রমণীয় কন্‌স্‌টেলেশনটিকে তিনি ভালোবাসতেন। প্লেনের প্রত্যেকটি যাত্রীকে স্বাচ্ছন্দ্য না দেওয়া পর্যন্ত সুখী হতে পারতেন না। আর কন্‌স্‌টেলেশনের মতো এক বিমানে তা বিশেষ দুঃসাধ্য হত না কারণ যাত্রীদের ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় উপকরণ সুনিপুণা এয়ার হোস্টেস্ গ্লোরিয়া প্রয়োজনমাত্রই হাতের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন। তাঁদের সন্তোষই ওঁর পুরস্কার। সিঙ্গাপুরের সেই প্রারম্ভিক যাত্রার পর থেকে কাশ্মীর প্রিন্সেস সম্পর্কে গ্লোরিয়ার একটা আসক্তি জন্মে গিয়েছিল।

গ্লোরিয়ার বিবরণ ধ্বনিত হয়ে চলল: "আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি কি?" লাউডস্পীকারে গ্লোরিয়ার স্বর আবার জেগে ওঠা মাত্র আমার জানা হয়ে গেছে, অতঃপর কী শুনব। লাইফ জ্যাকেটের ঘোষণা আর বিজ্ঞপ্তি। গোড়া থেকে আবার সেই চির-পুরাতন ব্যাপার। সমাসন্ন টেক্-অফ্-এর জন্যে তৈরী হয়ে ইঞ্জিন গুঞ্জন আর শিহরণ আরম্ভ করেছে, আর আমি জানলার বাইরে এয়ার ফিল্ড ঘিরে রাখা সবুজ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। "লাইফবোট ড্রিল উড়োজাহাজে একটি স্বাভাবিক রুটিন বলেই, জরুরী অবস্থায় জলে নামার নেহাত অসম্ভাব্য পরিস্থিতিতে তৈরী থাকার জন্যে আমরা লাইফজ্যাকেট ব্যবহারের পদ্ধতিটা আপনাদের দেখিয়ে দিতে চাই……।"

জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার হাসি পেল। কর্মীদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ফ্লাইট পারসার ডি-সুজা র‍্যাকের থেকে হলুদ রঙের লাইফ জ্যাকেটটা নিয়ে শুধু আমার একার জন্যে প্রদর্শনী শুরু করার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। পারসারের ইউনিফর্মে ওঁকে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছিল। ওর সহকর্মী পিমেন্টো, অপর ক্যাবিনে প্যাসেঞ্জারদের এই লাইফ-জ্যাকেট পরা দেখাচ্ছিলেন।

আমি বললাম, ডি-সুজা, এই সব ব্যাপার যদি শুধু আমাকে দেখাবার জন্যে তুমি এখানে শুরু করে দাও, তাহলে আমি চেঁচাব…। তিনি

তাঁর লাজুক লাজুক তারুণ্যের হাসি হেসে নিপুণ নিষ্ঠাভরে প্রদর্শনী দিয়ে চললেন। ক্যাবিনে আমি একা, ডি-সুজা সমস্ত লাইফজ্যাকেট ড্রিলটা করে যাবেন আর আমি বাইরে চেয়ে থাকব, এ এক বিশ্রী রূঢ়তা হবে। তাই আমি স্থির করলাম, অন্তত বার পঞ্চাশেক দেখা এই লাইফ বেল্ট ড্রিলটা সম্পূর্ণ মনোযোগসহকারে দেখব। স্মৃতির পাতা উলটে যখনি সেই সময়টার ওপর দৃষ্টি পড়ে তখনি মনে পড়ে তখনকার সেই সিদ্ধান্তের কাছে আমি আমার জীবন রক্ষার জন্য ঋণী- আর ঋণী গ্লোরিয়া আর ডি-সুজার কাছে।

গ্লোরিয়ার কণ্ঠস্বর আর ডি-সুজার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনায় বহুবার রিহার্সাল দেওয়া এক সামঞ্জস্য আছে। যখনই গ্লোরিয়া বলেন, 'আপনার লাইফ জ্যাকেট সহজেই পরে নেওয়া যায়', ডি-সুজা জ্যাকেটটি খুলে ধরেন, ধীর ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেন, পরিধান করেন আর ফিতেগুলিকে বেঁধে নেন। তারপর টগ্‌ল্ আর মাউথপীস দেখিয়ে দেন গ্লোরিয়ার কথার সঙ্গে সঙ্গে। "টগ্‌লে টান দিলেই নিজে নিজে একে ফুলিয়ে নেওয়া যায়, আবার মুখে করে বাতাস ভরে নেওয়ার জন্যেও এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে। মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজনঃ প্লেন থেকে পুরোপুরি বাইরে যাওয়ার আগে জ্যাকেটটি ফোলানো উচিত নয়।" পরিশেষে অভয়বাণী, "এই প্রদর্শনী এক সাধারণ বিধিমাত্র। ধন্যবাদ।"

লাইফ জ্যাকেটের বিজ্ঞপ্তির পর গ্লোরিয়া প্রবেশদ্বারের পাশে ছোট একটি সীটে বসলেন। টেক্-অফ্ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত সেইখানেই তাঁর বসার কথা। ক্যাথিড্রেল বম্বে জন্ হাইস্কুলে ছাত্রী অবস্থার সুখস্মৃতিতে মন তাঁর মগ্ন হল। সেই প্রাথমিক সঙ্গীত শিক্ষার কথাও। সঙ্গীতে তাঁর গভীর আকর্ষণ। ট্রিনিটি কলেজ অফ মিউজিকের পিয়ানোফোর্টে স্থানীয় উচ্চতম পরীক্ষায় মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। হয়তো এক সঙ্গীতশিল্পী হয়ে সারা পৃথিবীতে পিয়ানো শুনিয়ে বেড়াতে পারতেন কিন্তু আকাশ-পথের আহ্বান অন্যসব আকর্ষণীয় পেশার লোভের চেয়ে অনেক শক্তিশালী

ছিল। আর যে-সব পেশা নিলেও নিতে পারতেন···তাঁর সেই চূড়ান্ত নির্বাচনের কথা চিন্তা করতে করতে নিজের ছোট্ট হাতঘড়িটির দিকে টেক্-অফ্-এর ঠিক সময়টির জন্যে ফিরে চাইলেন। মুখে স্বল্প অরুণিমা আর ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, কারণ সেই ঘড়িতে শুধু সময়ই নয়, একটি প্রিয়মুখও উঁকি দিল। মুখচ্ছবি সেই উপহারদাতার, যার কাছে গ্লোরিয়া বাগ্‌দত্তা।

ইঞ্জিনে শক্তি নিয়োজিত হওয়ার টান শক্তিশালী কন্‌স্‌টেলেশনে অনুভূত হল আর বিমানখানি সম্মুখস্থ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

নিউজ ফ্ল্যাশ

নিউ দিল্লী, ৩১শে মার্চ, ১৯৫৫

প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, পার্লামেণ্টে ভাষণদান কালে সমাসন্ন বান্দুং সম্মেলনকে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের পক্ষে অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন, "এই মিলন এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের, যাদের লক্ষ্য শান্তি······"

নিউ দিল্লী, ৩রা এপ্রিল, ১৯৫৫

বান্দুং সম্মেলনে যে দেশসমূহ আমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁরা হলেন: আফগানিস্তান, বর্মা, কাম্বোডিয়া, সিংহল, ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, গোল্ড-কোস্ট, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ইরান, জাপান, জর্ডান, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস্, সাউদি আরব, সুদান, সিরিয়া, থাইল্যাণ্ড, তুর্কী, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, উত্তর ভিয়েৎনাম এবং চীন গণতন্ত্র; পৃথিবীর অর্ধেকেরও অধিক জনসংখ্যার তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করবেন। অনিমন্ত্রিত শক্তিবর্গের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও চিয়াংকাইশেকের ফোরমোজা······'

হংকং থেকে

ঘননীলাকাশে উজ্জ্বল সূর্যালোক। আরো ঘননীল প্রতিদ্বন্দ্বী পাহাড়ের সারি, ওষ্ঠবদ্ধ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল পর্বত-মালার পটভূমিকায় বিমানখানি নিতান্তই ক্ষুদ্র বোধ হলেও কাশ্মীর প্রিন্সেসের ইঞ্জিনগুলি এক নিশ্চিত গর্জন তুলে রানওয়ের মাঝামাঝি যেতে না যেতেই মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল। ক্যাপটেন জাতার তাকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিক থেকে সমুদ্রের কাছে ফাঁকায় নিয়ে এলেন। স্বতই বলে উঠি, 'এই তো একজন প্রথম শ্রেণীর চালক···।' হংকং এমনি এক বিমান-পোতাশ্রয় যেখানে পাইলটের টেক্ অফ্-এর বৈশিষ্ট্য থেকেই তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হংকং নগরীর আকাশে কাশ্মীর প্রিন্সেস চক্রাকারে ঘুরল, নীচের অপস্রিয়মাণ, উজ্জ্বল, বিবিধ ধারায় স্পন্দিত জীবনছন্দ চোখে পড়ল। তারপর প্রিন্সেসকে তার নিজের নির্দিষ্ট পথে আনা হল। জাকার্তা অভিমুখে সাড়ে সাত ঘণ্টার এক অবিরাম যাত্রা। সাড়ে সাত ঘণ্টা আকাশপথে এক সুদীর্ঘ সময় আর ততোধিক দীর্ঘ পথ পরিক্রমাও বটে। যা আমাকে সর্বাধিক চিন্তিত করেছিল, তা হল, জাকার্তায় বিশ্রামলাভের যোগ্য অত্যল্প সময়। পরের প্রত্যূষে আমাদের স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের কথা স্থির হয়ে আছে। এই আকাশ-চারণের মাঝেই আমায় সময়মত ঘুমিয়ে নিতে হবে। কিন্তু শব্দ আর কাঁপনের মধ্যে ঘুমানো বেশ শক্ত।

সচরাচর ছত্রিশজন যাত্রীর বসার আসন টুরিস্ট কম্পার্টমেন্টে। সেখানে একা আমি, অনাবিষ্ট ভাবে, চোখে এ নীরব ঘোষণা নিয়ে যেন বসেছিলাম ; যা কিছু দেখছি আমি সবেরই অধীশ্বর। ভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টি ছিল অল্পের মাঝে সীমায়িত কেবলমাত্র এই টুরিস্ট

কম্পার্টমেণ্টখানিতে। গত রাতের নিদ্রাহীনতার জন্যে আলস্য ক্রমে আমাকে আচ্ছন্ন করল। শূন্য চোখে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম। পিছনের কম্পার্টমেণ্টে যাত্রীদের মৃদু আলাপের গুঞ্জন, ইঞ্জিনের একঘেয়ে অবিচ্ছিন্ন গুঞ্জরণ বা ঘড়ির বিশ্বস্ত সেকেণ্ডের কাঁটাখানির দ্রুতগতি -কোনোকিছুই আমার মনোযোগ অধিকার করতে পারছিল না। নির্মেঘ আকাশ বেয়ে কাশ্মীর প্রিন্সেস অনায়াসে উড়ে চলেছে, প্রতি অঙ্গে সাবলীল কাজের প্রবাহ, যেন প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই বয়ে চলেছে। ঘুমের আশা ছিল না দেখে আমি কতগুলি ছবির ম্যাগাজিন তুলে নিলাম।

গ্লোরিয়া অনবরত পিছনের প্যাসেঞ্জারদের কম্পার্টমেণ্টে খাবার আর পানীয় নিয়ে যাওয়া-আসা করছিলেন। মাঝে মাঝে ডি-সুজা আর পিমেণ্টো ট্রেতে 'সফ্‌ট ড্রিঙ্ক' আর সিগরেটের টিন নিয়ে যাচ্ছেন, যাত্রীদের জন্যে। আমি টয়েলেটে যাবার জন্যে উঠে পিছনের দিক দিয়ে যাবার সময় ক্যাপটেন জাতারকে ওদিক থেকে ফিরতে দেখলাম। কাছে এসে বেশ অন্তরঙ্গভাবে হাসলেন উনি। সম্ভবত আমার মুখের নিদ্রাতুর ভাব ওঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, তাই কথা না কয়ে নিজের কর্মস্থলে গিয়ে বসলেন। টয়েলেটে গিয়ে স্নান সেরে নিলাম, তারপর কিছু আহারাদির আশায় ক্রু-কম্পার্টমেণ্টের দিকে গেলাম, কারণ হংকংএ আমার লাঞ্চ সারা হয় নি। সেখানে দেখি ক্যাপটেন দীক্ষিত, পিমেণ্টো আর ডি-সুজা বেশ এক ঘরোয়া গল্পের আসর বসিয়েছেন। আমিও দলে যোগ দিলাম। ক্যাপটেন জাতার কণ্ট্রোলে আর ডি-কুন্‌হা ইঞ্জিনের তাপ আর চাপের মাত্রার ওপর নজর রেখে 'লগ' নিয়ে ব্যস্ত। ফ্লাইট নেভিগেটর পাঠক তাঁর বিবরণ লিখতে নিযুক্ত, জাকার্তার পথ যে সব চিহ্ন অনুসরণ করে যেতে হবে তারই খবর দিয়ে চলেছেন ক্যাপটেনকে।

ডি-সুজা আমাদের ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য গেলেন আর ফিরলেন সদ্য ফোটানো ধূমায়িত চা হাতে নিয়ে। আহারের কথা ভুলে আমি চায়ের

কাপ নিয়ে 'পড়লাম। চায়ে আমার এক দুর্বলতা আছে। যে কোনো সময়ই আমাদের কাছে চায়ের সময়। তখনকার চা একেবারে তাজা আর অতি উপাদেয় ছিল। আপাতত ক্ষুণ্নিবৃত্তি হয়ে গেল। কাপে চুমুক দিয়ে দীক্ষিত কনটিনেন্ট ভ্রমণকালে সম্প্রতি কেনা তাঁর কন্টাফ্লেক্স ক্যামেরাখানা বার করলেন। অপূর্ব সুদর্শন আর সুগঠিত ছোট্ট ক্যামেরাখানি। ঢাকা খুলে, তুলে-ফেলা ফিল্মের রোলটা বার করে নিলেন দীক্ষিত, তারপর আর-একটা নতুন রোল ক্যামেরায় পরাতে পরাতে আমায় শুধালেন, "কার্নিক, তোমার ক্যামেরাটা কী যেন!"

"সুপার আইকন", আমি বললাম।

"দেখি না", দীক্ষিত বললেন, "যদি মালপত্রের ঘরে না রেখে থাক, তাহলে নিয়ে এসো না।"

'মালপত্রের ঘরে অবশ্য নেই", আমি বেপরোয়া ভাবে বলি, 'তবু এখানে আনা চলে না।'

অবাক হয়ে তিনি জানতে চান, 'আনা চলে না কেন?'

রসিকতা বেশী টানতে গেলেই তার রূপ মরে যায়। 'এবারে ক্যামেরা নিয়ে কী হবে?' আমি জবাব দিলাম। 'সন্ধ্যার পর জাকার্তা পৌঁছাব, আবার পরের ভোরে ফিরতি মুখে রওনা হব। শুধু একটা অনাবশ্যক বোঝা হত এরোপ্লেনের···কয়েক আউন্স বাড়াবার পক্ষপাতী নই আমি।'

তুলে-ফেলা ছবির রোলটা হাতে নিয়ে দীক্ষিত বললেন, 'ব্যাঙ্ককে তোলা আমার কতগুলো সেরা ছবি আছে এর মধ্যে। কেমন উঠল জানার জন্যে মনটা ছটফট করছে।' তারপর ক্যামেরা নিয়ে আসার কারণটা ব্যক্ত করলেন। ব্যাঙ্ককে 'ক্রু'-এরা সপ্তাহখানেক ধরে আছে। জাকার্তা হয়ে ওদের বম্বে ফেরার কথা। আমার চিন্তাশীলতারও বেশ তারিফ করলেন। জবাবে আমি জানালাম, 'জাকার্তাতে আমার একমাত্র চিন্তা হল, যতটা সম্ভব ঘুমিয়ে নেওয়া। প্লেনে বাপু আমার ঘুম হয় না।'

'তুমি নেহাত আশাবাদী', হাসি চেপে দীক্ষিত বললেন, 'জাকার্তায় গিয়ে ঘুমিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছ?'

'আশাবাদী বটেই তো', আমি বলি, 'জাকার্তায় পুরোপরি ঘুমিয়ে নেবার বাধা কি? বিশেষত, আমাদের তেজস্বিনী প্রিন্সেস এমন মহাপ্রাণা, অর্থাৎ সুস্থ সতেজ, যে জাকার্তায় পৌঁছে আমার প্রায় কিছু করবারই থাকবে না।'

'মিস্টার কারনিক, বান্দুং কনফারেন্সের কথা জান তো?' 'দীক্ষিত হাসলেন, "জাকার্তায় হোটেলে স্থানলাভ অসম্ভব। সেইজন্যেই ব্যবস্থা হচ্ছে, জাকার্তায় ডেলিগেটদের রেখে সিঙ্গাপুরে ফিরে এসে তোমার সুখনিদ্রাটুকু আহরণ করার। অবশ্য ঘণ্টা চারেক ঘুম জুটে যেতে পারে যদি তোমার প্রিন্সেস্ কোনো নষ্টামি দুষ্টামি না করেন।"

'হায় ভগবান, তাহলে আমি এখানে বসে করছি কী?' আমি বরং কেবিনে যাই, আর কয়েক সেকেণ্ড ঘুমিয়ে নিই।" এই বলে ওদের জমাট আড্ডা ছেড়ে আমি কেবিনে গেলাম আর নিষ্ঠাভরে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হলাম। কিন্তু মন্দভাগ্য, যতই চেষ্টা করি, ঘুম আর আসে না। আবার সেই ছবির পত্রিকাগুলোর আশ্রয় নিলাম বাধ্য হয়ে।

হংকং ত্যাগের পর ঘণ্টা কয়েক কেটে গেছে। গ্লোরিয়া বেরী কয়েক মুহূর্ত বিশ্রামের অবসর পেয়ে আমার পাশের আসনে এসে বসলেন। স্বভাবতই আমরা পূর্বেকার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নিয়ে গল্প শুরু করলাম।

যখনই সেই সময়ের কথা ভাবি ভারী আশ্চর্য বোধ হয় যে আমরা দুজনে একেই স্রোতে ভাসছিলাম। দুজনে এক পথেরই পথিক। প্রায় বছর খানেক ধরে দুজনেরই বাগ্‌দানপর্ব সমাধা হয়ে আছে, আর দুজনেই আশু বিবাহের প্রতীক্ষা করে আছি। সিঙ্গাপুরে প্রথম যাত্রার সময় আমার ফিঁয়াসীর জন্যে আমি একটি ঘড়ি কিনেছিলাম আর গ্লোরিয়ার ফিঁয়াসেও তাঁকে তার জন্যে একটি ঘড়ি কিনে নিতে বলেছিল। ঘড়িটা কেমন চলছে আমি জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন তাঁর আদরের ঘড়িখানি রত্নবিশেষ। তারপর আমার বাগ্‌দত্তার উপহার খানির কথাও জানতে চাইলেন. বললাম, 'কোনো অনুযোগ শুনি নি।'

কিছুক্ষণ গ্লোরিয়া নীরবে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে রইলেন। আমি মনে করলাম তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সহসা ফিরে বললেন, "এই অতি-নামী-দামী লোকেদের নিয়ে যাত্রাগুলোয় সঙ্গী হতে আমার ভালো লাগে না, আমার মনে হয় এই ফ্লাইটগুলো নিরাপত্তার দিক থেকে নিঃশঙ্ক নয়।"

তাঁর কথার গুরুত্ব হ্রাস না করেও আমি আশ্বাস দিই, "দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আমি বলতে পারি।"

সমাসন্ন বিপর্যয়ের একটা পূর্বাভাস তিনি পেয়েছিলেন যেন। আমি ওঁর উক্তির কথাই চিন্তা করছিলাম। ফিরে দেখি তিনি ইতিমধ্যে সীট ছেড়ে উঠে চলে গেছেন।

ইত্যবসরে কাশ্মীর প্রিন্সেস নিষ্ঠাভরে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে চলেছে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা হয়েছে হংকং ত্যাগ করে এসেছি। উদর বিভাগ খাদ্যের চাহিদা এতক্ষণে বেশ জানান দিচ্ছিল। গ্যালিতে গিয়ে দুটি স্যাণ্ডউইচ্, একটি কেক, একটি কলা আর এক কাপ কফি নিলাম। খাবারগুলো নিয়ে কক্‌পিটে রেডিও অফিসারের ফাঁকা টেবিলটা অধিকার করা গেল। ডি-কুন্‌হা আমার কাছেই ছিলেন। খেতে খেতে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। মাংসের স্যাণ্ডউইচ আমার বিশেষ ভালো লাগে না। বড় জোর তার অর্ধেক খেতে পারলাম। বদ্ধ জায়গায় থেকে কেকটাও বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। এক কামড় খেয়ে তাকেও বাদ দিতে হল। কলা আর কফি বেশ তৃপ্তি সহকারে খেলাম। ক্ষিদেটা ঠাণ্ডা হওয়ায় এবার খানেক ঘুমের আমেজ এল। ঘণ্টাখানেক পরে আবার কক্‌পিটে আসব কথা দিয়ে ডি-কুন্‌হার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেবিনে ফেরার জন্যে উঠলাম। সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে একবার যন্ত্রপাতিগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম।

কেবিনে ফিরে জুতো জোড়া খুলে রাখলাম। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাগত হলাম।

আমি যদিও ঘুমালাম, কক্‌পিটে সচেতনতা বা যাত্রীদের কেবিনে নিম্নস্বরের গুঞ্জন অব্যাহত রইল।

ডি-সুজা আর পিমেণ্টো বিনীত প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়ালেন : 'হুইস্কি-সোডা বা জিন্···কিছু দেব ?' তাঁদের আশা ছিল নিউ চায়নার এই বিপ্লবীরা পানীয় নির্বাচনের ব্যাপারে একটু মনোযোগী হবেন, বিশেষত তাঁদের দেশে যখন 'প্রহিবিশন' নেই। তাঁরা অবাক হলেন যে, হুইস্কি-সোডা বা জিনে কারো পক্ষপাতিত্ব নেই বরং অরেঞ্জ আর লেমন্ স্কোয়াশ চেয়ে বসলেন।

ডি-সুজা আর পিমেণ্টোর জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ব্রিটিশ বা আমেরিকান সিগারেট নিতে অস্বীকার করলেন প্রতিনিধিরা। নিজেদের দেশে তৈরী সিগারেট ওঁদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তাই বার করলেন তাঁরা।

ইতিমধ্যে গ্লোরিয়া লিস্ট হাতে টিকিট চেক্ করা শুরু করেছেন। কেবিনের পিছন দিকের সীট থেকে টিকিট দেখা শুরু করলেন গ্লোরিয়া। মৃদু হেসে সুস্বরে প্রশ্ন করছিলেন তিনি, 'আপনার টিকিটখানি দয়া করে একবার দেখাবেন ?'

লি পিঙ্ আর শি চি য়াঙ্ প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে চশমাপরা অল্প-বয়সী দুই যাত্রী, পাশাপাশি বসেছিলেন। পরের প্রতিনিধি ছিলেন চুং পু য়ুয়াঙ---উনিই সর্বজ্যেষ্ঠ। মুখে অনেকগুলি কঠিন রেখায় বিবিধ অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি হো ফেঙ্ কোর সঙ্গে কথাবার্তায় রত ছিলেন। সম্ভবত চুং পু য়ুয়াঙ্ তাঁর কোন্ মূল্যবান অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। গ্লোরিয়া একে একে সব চীনা প্রতিনিধি-বর্গের টিকিট দেখা শেষ করলেন।

শেষের দুজন ছিলেন ইউরোপীয়। তাঁরাও জাকার্তা যাচ্ছেন, অতএব তাঁরা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। সুপুষ্ট ব্রীফ-কেস ছাড়াও ছোট দুটি টাইপরাইটার তাঁদের সীটের নীচে রাখা। পোলিশ সাংবাদিক মিঃ স্ট্রাস জেরিমির টিকিট দেখার পর গ্লোরিয়া প্রবীণতর ডক্টর ফ্রেড্রিক্ জেন্সেনের দিকে ফিরল। অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক ডক্টর জেনসেনের টিকিট ছাড়া অন্য সকলের প্রবেশপত্র যাচাই হয়ে গিয়েছিল। ডক্টর জেনসেন

তখন বিপুলকায় একখানি বইয়ে নিবিষ্টচিত্ত, গ্লোরিয়ার বিনয়মধুর স্বর কানে গেল : 'আপনাকে একটু বিরক্ত করছি, ডক্টর জেনসেন্, এক মিনিটের জন্যে···আপনার টিকিটখানি দেখতে পারি কি?' এয়ার হোস্টেস তাঁর নাম জানলেন কী করে? ডক্টর জেনসেন্ বিস্মিত হলেন। অবশ্য বিস্ময় আর রইল না; কারণ গ্লোরিয়ার হাতে যাত্রীদের নামের লিস্টে চোখ পড়তেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর নাম ছাড়া অপর সকলের নামই চিহ্নিত হয়ে গেছে। টিকিট দেখতে দেবার সময় তাঁর ভঙ্গী থেকেই বোঝা যায় যে তিনি একজন সাধারণ সংবাদিক মাত্র নন। ডক্টর ফ্রেড্রিক জেন্সেন্ একজন ডাক্তার ছিলেন, ছিলেন দেশপ্রেমিক, লেখক আর কবি। আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সাথী হয়ে তিনি ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। মাও সে-তুংএর সেনাবাহিনীর শুশ্রূষা করেছেন। নবজাত চীনের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ইউরোপবাসীর কাছে পেশ করেছেন আর মুক্তির জয়ধ্বনি তুলেছেন তাঁর কাব্যে। এবার বান্দুংএ তাঁর সব গৌরবের সেরা দায়িত্ব; কিন্তু নিয়তির ইঙ্গিত ছিল অন্য দিকে।

পিমেণ্টা আর ডি-সুজা চা আর স্কোয়াশ তৈরী করতে ব্যস্ত ছিলেন। গ্লোরিয়া তাঁদের সাহায্যার্থে গ্যালিতে উপস্থিত হলেন।

এয়ার-লাইনের কমাণ্ডারেরা তাঁদের রক্ষণাধীন যাত্রীবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত খোঁজখবর নেওয়াকে দায়িত্বের অঙ্গ বলেই মনে করেন। কমাণ্ডার জাতার জানতেন যে তরুণী গ্লোরিয়া, উদ্যোগী ডি-সুজা বা সদাহাস্যমুখ পিমেণ্টা যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য যথাসাধ্য করবেন। এয়ার-লাইনের পক্ষে কমাণ্ডার জনসাধারণের সঙ্গে যোগা-যোগের অধিকর্তা বিশেষ, অতএব কমাণ্ডার জাতার দীক্ষিতকে বললেন, 'তুমি কন্ট্রোলে বোসো, আমি যাত্রীদের সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ করে আসি··· ।'

গ্যালিতে এসে তিনি অবাক হলেন। অরেঞ্জ, লেমন স্কোয়াশ আর চা তৈরী হচ্ছিল। গ্লোরিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওঁদের কোনো পানীয় দেওয়া হচ্ছে না?"

"শুধু 'সফ্ট ড্রিঙ্ক' কমাণ্ডার," জবাব দিলেন গ্লোরিয়া।

কমাণ্ডার এই তরুণ জাতির নবীন বিপ্লবীদের সরলতায় মুগ্ধ হলেন। কেবিনে যাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি এলেন। দেখলেন ওঁরা বেশীর ভাগই নোট নিতে ব্যস্ত। তার ওপর ভাবলেন, সম্ভবত খুব অল্প কয়েকজনই ইংরাজীতে আলাপ করতে পারবেন, তার চেয়ে এঁদের বিরক্ত না করাই শ্রেয়। কেবিনের এক কোণে লাউঞ্জে যাওয়া স্থির করলেন উনি। যাত্রীদের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখন যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা সম্মেলনের নথিপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন না, তাঁরা ওর দিকে ফিরে হাসলেন। তিনিও তার নিজস্ব স্মিতহাস্যে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

আমি প্রায় আধোঘুমন্ত অবস্থায় কমাণ্ডার জাতারকে লাউঞ্জ থেকে কক্‌পিটে ফেরার সময় দেখলাম। ওঁর সামনে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক নয় ভেবে ওই অর্ধচেতন অবস্থাতেই যতটা সম্ভব অ্যাটেনশন হয়ে পড়লাম। কমাণ্ডার সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, তোমার তো জেগে থাকার দরকার নেই···। আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ক্যাপটেন জাতার কক্‌পিটে যেতে যেতে নেভিগেটর পাঠকের চার্টে একবার ঝুঁকে দেখলেন। "কী ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করলেন উনি, "এখন আমরা কোথায় আছি?"

পাঠক তখনি চার্টের ওপরে পেন্সিল ছোঁয়ালেন আর জানালেন 'পারাসেল' দ্বীপপুঞ্জ এখনি আমরা পেরিয়ে এসেছি, আর বম্বে রীফ পার হচ্ছি।"

"বম্বে রীফ", জাতার বললেন, "পৃথিবীর এই কোণে!" ওঁদের দুজনেরই বেশ অবাক বোধ হল, দক্ষিণ চীন সমুদ্রের এই ছোট দ্বীপটির নাম ভারতবর্ষের এক প্রধান নগরের নাম অনুসারে।

ক্যাপটেন জাতার আসনে বসতেই ক্যাপটেন দীক্ষিত তাঁকে বললেন, "আমরা এখনি একটি সুন্দর প্রবাল দ্বীপ পেরিয়ে এলাম; তার নামটা আন্দাজ করো তো দেখি?"

কমাণ্ডার হেসে জানালেন, "আমি পাঠকের সঙ্গে এখনি চার্টে ছিলাম।" জাতার দীক্ষিতকে বললেন, "তুমি খানিক বিশ্রাম করে নাও।" দীক্ষিত ক্লান্ত বোধ করছিলেন না। জাতারের সাহচর্য কঠোর শ্রমের উৎসাহ জোগায়। দীক্ষিত শুধু জবাব দিলেন, "না ক্যাপটেন, আমি বরং কনট্রোলে থাকি। তোমারই সম্ভবত বিশ্রাম প্রয়োজন।"

দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। কমাণ্ডারের দিকে ফিরে তাকিয়ে দীক্ষিতের বুঝতে অসুবিধে হল না যে কোনো এক চিন্তাক্লেশ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। দীক্ষিত আর জাতার বহুদিনের বন্ধু। ভ্রাতৃ-প্রতিম অন্তরঙ্গতা দুজনের, তাই ক্যাপটেন জাতারের দুশ্চিন্তার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে দীক্ষিতের বাধা ছিল না. "কিছু ভাবছ, ক্যাপটেন?"

"পূর্বের দিকে পোস্টিং অর্ডারটার কথা ভাবছি।"

"ইউরোপীয় আবহাওয়ার পরে ব্যাপারটা একটু কঠিন হবে।" "যাক গে, বাছবিচারের বিশেষ প্রয়োজন নেই, পোস্টিংটা শীতের সময়ও নিতে পারি।"

"তাহলে সবই ঠিক থাকে।"

"একরকম ঠিকই বটে। তবে পুরোপুরি নয়।"

"বুঝলাম না কথাটা?"

"ডিকি, বুঝতে পারছ না যে সঙ্গী-সাথীদের থেকে বহুদূরে রয়ে যাব..." জাতার বলে চললেন, "তুমিও আমার সঙ্গে পুবের দিকে একটা পোস্টিং নিয়ে নাও না কেন? তুমি যদি থাক, তাহলে সবটাই চমৎকার হয়।"

তুমি তো জানো ডি. কে. (ক্যাপটেন জাতারের নামের আদ্যক্ষর) আমার পারিবারিক দায়িত্বের কথা। তোমার সঙ্গে পোস্টিং-এ যোগ দেওয়া আমার পক্ষে বোধহয় সম্ভব হবে না...ফিরে গিয়ে চিন্তা করা যাবে। তোমার সঙ্গে ফ্লাইং এক সৌভাগ্যের কথা..."

পাঠক ককপিটে এসে বিমানের অবস্থান আর রিপোর্ট আর নতুন

দিক-নির্দেশক কার্ড দিয়ে বলে গেলেন, "ক্যাপটেন, আর উনিশ মিনিটে আমরা নাতুনা দ্বীপপুঞ্জের ওপর পেঁৗছব…"

ক্যাপটেন জাতার কোর্স-কার্ডখানি ক্যাপটেন দীক্ষিতের হাতে দিলেন। তিনি 'স্বয়ংক্রিয় চালকব্যবস্থায়' প্রয়োজনমত রদবদল করে বিমানকে নব নির্দেশিত পথের অনুগামী করলেন। বুঝতে পারলেন, আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই অবস্থানিক বিজ্ঞাপন পাঠাতে হবে।

যখন দীক্ষিত কটি আঙুলের নিয়ন্ত্রণে ১,০৭,০০০ পাউণ্ডের বিমানখানির গতিপথ পরিবর্তন করছেন, স্বয়ংক্রিয় চালক ব্যবস্থার সাহায্যে, জাতার নীরবে বসে ছিলেন আর তাঁর মন শিক্ষানবিশির সেই দিনগুলিতে মগ্ন হয়ে ছিল। ওঁর মনে হয়ে থাকবে পারিবারিক সেই বিরূপ তর্কাতর্কির কথা, যখন জাতার এয়ার-লাইনের চালক হবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। বিপত্তি-সম্ভাবনা তাঁর অজানা ছিল না। বাবা-মা আশঙ্কার কথা উত্থাপন করাতে তিনি উত্তর করেছিলেন, "মরতে যখন হবেই, রোগে ভুগে, বিছানায় শুয়ে মরার চেয়ে বরং বিমানের মধ্যে মরা ভালো।" ওঁর দৃঢ় সংকল্পের কাছে বাবা-মাকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

প্রথম একা ওড়ার কথাটাও তাঁর মনে পড়ছিল। ওঁর শিক্ষক পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বলেছিলেন, "অন্যের পক্ষে পথচলা যেমন, তোমার পক্ষে আকাশচারণও তাই, আমি জানি।" থ্রট্‌ল্ (ইঞ্জিনের গতিবর্ধক) সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে নির্বিঘ্ন 'টেক অফ্' করার সঙ্গে সঙ্গেই জাতার বুঝলেন, ভবিষ্যতে মহত্তর দায়িত্বের এ শুধু সূচনা।

প্রথম একক আকাশপথে ওড়া আর আজকের মধ্যে সময় কি দ্রুত বয়ে গেছে, ভাবলেন উনি। বিশ বছরের সুদীর্ঘ কার্যকালে আপন জাতীয় পতাকা তিনি বহুদেশে বয়ে নিয়ে গেছেন। দ্রুত নির্বিঘ্ন পথে বয়ে বেড়িয়েছেন নমস্য ব্যক্তিবর্গকে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরুকেও।

বিপদসংকুল অনেক অভিযাত্রার কথাও তাঁর স্মরণ হয়। ওঁর শিক্ষাকালে আকাশচারণ এক দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। এখন

বৈমানিক ও সহযোগী বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির জন্যে বিমান-চালনা এক শিল্পকর্ম আর বিজ্ঞানপ্রয়োগের মিলিত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপত্তির সম্ভাবনা এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে, অনুসন্ধানে বা ত্রাণ-কার্যে ছাড়া। তারপর তাঁর মনে পড়ে, আল্‌প‌্স্‌ পর্বতমালায় "মালাবার প্রিন্সেসের" নিখোঁজ হওয়ার কথা। বন্ধুবর ক্যাপটেন সেণ্ট আর সহযোগী তরুণ কর্‌গাঁওকার্‌ চালনা করছিলেন বিমানটিকে। "মালাবার প্রিন্সেস" নিরুদ্দিষ্ট হবার পর বৈদেশিক অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে জাতারও বেরিয়েছিলেন। সমস্ত আল্‌প‌্স্‌ পর্বতমালা জুড়ে তখন ঘন তুষারপাত হচ্ছিল। গর্জনমুখর বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত তুষারঝঞ্ঝা দৃষ্টিকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আবহাওয়ার বিরূপতায় অন্য বিমানেরা ফিরে আসার পরও জাতার তাঁর অদম্য সাহসিকতায় সম্ভাব্য কোনো জীবনাবশেষের (সার্‌ভাইভর) সন্ধান চালিয়ে গিয়েছিলেন। অল্প পরে মাউণ্টব্ল্যাঙ্কের পাশে বিমানটির ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলেন, সেই দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে ফিরলেন। যাত্রী বা কর্মীদের কারো জীবিত থাকার দুরাশা মাত্র নেই। তাঁর বন্ধু ক্যাপণ্টেন সেণ্টের মৃত্যু ছাড়াও জাতারের তখন মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষ একজন সম্ভাবনাসম্পন্ন বিমান-চালককে হারাল, তরুণ কর্‌গাঁওকারের মৃত্যুতে।

দীক্ষিত তখন পরিচালনায় বসে। রেডিওতে কোনো স্টেশনের সঙ্গে কথা বললেন। স্মৃতি অবগাহন সেরে উঠে দাঁড়ালেন জাতার ; প্রশ্ন করলেন, "কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ?"

"সিঙ্গাপুরের সঙ্গে", দীক্ষিত জানালেন, "তারা আমাদের গতিপথ খুব তীক্ষ্ণ নজরে অনুসরণ করে চলেছে।"

"তুমি বলতে চাও, ওরা আমাদের প্লট করে চলেছে ? কেন ? অবাক কাণ্ড !" জাতার বললেন।

"সম্ভবত আমরা ভি-আই-পি (ভেরি ইম্‌পরটেণ্ট পারসনেল) নিয়ে চলেছি বলে", দীক্ষিত জানালেন।

জাতার ডি-কুন্‌হার দিকে ফিরলেন। তিনি ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতি

গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, "এনডিওরেন্স গ্যাস কতখানি আছে, (গ্যাস অর্থে—গ্যাসোলিন, অর্থাৎ পেট্রল)?" এ প্রশ্নের অর্থ হল, 'বাকি পেট্রোলে বিমানটি আর কতদূর উড়তে পারবে?'

ডি-কুন্হা তাঁর সামনে রাখা বিবরণীতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর পরিমাপক যন্ত্রগুলিতে বিজ্ঞাপিত হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে জানালেন, "সাড়ে চার ঘণ্টার মতো, ক্যাপ্টেন।"

জাতারের মুখে সন্তোষের ভাব ফুটল। জাকার্তা পৌছোতে আর মাত্র আড়াই ঘণ্টার পথ অতিক্রম করতে হবে। আর দু-ঘণ্টার মতো পেট্রল থেকে যাবে। পরিকল্পনা অনুসারে সব কিছু চলেছে, নির্বিঘ্ন আর বিধিবদ্ধ।

ক্যাপেটেন দীক্ষিত মাইক্রোফোন তুলে নিলেন আর মাইক্রোফোনে তাঁর শান্ত স্বর সিঙ্গাপুরের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পেঁছিল: "হ্যালো, সিঙ্গাপুর,···ভিক্টর্ একো···পাপা···কলিং (কাশ্মীর প্রিন্সেসের বেতার পরিচিতির সংজ্ঞা)।···অবস্থান: দ্রাঘিমা ১০৮° পূর্ব···আর অক্ষাংশ ···৪° উত্তর,···উচ্চতা: ১৮,০০০ ফিট······, বায়ুবেগ ১৮৫ নট্ (ভূ-পৃষ্ঠে এই বেগ ঘণ্টায় ২৮০ মাইলের সমান); ও···এ···টি (বাইরের তাপমান) ২° ডিগ্রি: ···আকাশ নির্মেঘ···ই···এ···টি··· (নিরূপিত পৌছানোর সময়) জাকার্তা ১১-২৫ জেব্রা (গ্রীনউইচ মধ্যবিধ সময়)।

সরাসরি জাকার্তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে তখনো আমরা অনেক দূরে, তাই দীক্ষিতকে জাতার নির্দেশ দিলেন, সিঙ্গাপুর মারফত জাকার্তাকে জানিয়ে দিতে যে সেখানে কাশ্মীর প্রিন্সেসের জন্যে রাত্রি-কালীন অবতরণ ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। সিঙ্গাপুর থেকে পরে খবর এল যে, আমাদের বার্তা যথাস্থানে পেঁছানো হয়ে গেছে। এতক্ষণ এঁরা ব্যাঙ্কক আর সিঙ্গাপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। অনতিবিলম্বে জাকার্তার বেতার সীমার মধ্যে পৌছলেন তাঁরা, আর

ক্যাপটেন দীক্ষিত 'ওয়েভ ব্যাণ্ড' বদল করে নতুন ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করলেন।

জাকার্তার অপারেটরের জোরালো আর স্পষ্ট স্বর ভেসে এল। 'কাশ্মীর প্রিন্সেসে' চৌ-এন্-লাই আছেন কিনা, সে জানতে চাইছিল। চালকেরা দুজনেই অবগত ছিলেন যে চীনা প্রধানমন্ত্রী অনুপস্থিত। কমাণ্ডারের সম্মতি পেয়ে দীক্ষিত উত্তর দিলেন: 'না।'

সেই সময়ে ক্যাপটেন জাতার অবশিষ্ট পেট্রলের পরিমাণ পরীক্ষা করছিলেন। মিস্ বেরী, ডি-সুজা আর পিমেণ্টা চায়ের পাত্র ফিরে নিয়ে চলেছেন···আর যাত্রীরা চা-পান পর্ব সমাধা করেছেন। তাজা হয়ে, সবাই আরাম করে বসেছেন। নিজেদের মধ্যে কেউ কেউ আলাপ-আলোচনা করছেন, কেউ বা পত্র-পত্রিকা উলটোচ্ছেন। ইংরিজী বলতে পারেন, এমন একজন চীনা প্রতিনিধি ডি-সুজার কাছে জানতে চাইলেন, "জাকার্তায় কটার সময় পেঁ ৗছব?" যে-কোনো যাত্রাতে এই হল সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্ন। ডি-সুজার উত্তর করতে অসুবিধা হয় না,- "স্থানীয় সময় সাতটা তিরিশে," অজান্তে হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি জবাব দেন।

গ্রীনউইচ সময় অনুসারে তখন ০৯:২৪ জি-এম-টি···সেকেণ্ডের কাঁটা দ্রুতবেগে পঁচিশের দিকে ধাবমান।

ঠিক সেই সময়ে বিমানের বিভিন্ন জনের মন বিবিধ জায়গায় নিবদ্ধ। এশিয়া-আফ্রিকার জনগণের একতা গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সম্মেলনে মগ্ন যাত্রীদের মন। জাতার জানলার বাইরে নীল-নির্মল মহাকাশে আর নিচের প্রশান্ত সমুদ্রে দৃষ্টি প্রসারিত করে ভাবছিলেন, 'যে কোনো জায়গায় পোস্টিংই ভালো, যদি তোমার আশেপাশে থাকে সুহৃদেরা,' ভাবতে ভাবতে তিনি ফিরে দেখলেন দীক্ষিতের দিকে। দীক্ষিত ভাবছিলেন, 'যাই হোক, ওই রকম একটা পোস্টিং নিয়ে বন্ধুর সঙ্গেই ওঁর যাওয়া উচিত।' তারপর তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের কথা ভাবলেন, বিশেষত বড়ো ছেলে ভারতের কথা। তার লেখাপড়া একটা সমস্যা·

হবে। তা হলেও তিনি মনে মনে স্থির করলেন, 'যদি আন্দ্রা বিদেশে পোস্টিংটাই বেছে নিই, ভারতের পড়াশোনার ক্ষতি হতে দিলে চলবে না; ওকে কোনো নামজাদা পাবলিক স্কুলে পাঠিয়ে দেব'খন।' ডি-কুন্হার মনে পড়ছিল, মা আর স্ত্রীর কাছে পাঠানো ইস্টারের অভিনন্দনের কথা, ডি-সুজার মন ঘরমুখো এক পিছুটানে ভরে ছিল। ইস্টার উৎসব একাই এবার যাপন করতে হয়েছে তাঁর পত্নীকে। সুদূর গোয়াতে তাঁর মায়ের কথা ভাবছিলেন পিমেণ্টা। গ্লোরিয়ার মানসপট জুড়ে মধুর এক মূর্তি—তাঁর 'ফিঁয়াসের'। ক্ষুদ্র হাতঘড়িটার দিকে চাইতেই মৃদু হাসিতে তাঁর মুখ ছেয়ে গেল।

আর তখনি ঘটল, যা ঘটার······গুম্······একটি বিস্ফোরণের শব্দে সচকিত সকলে, ভাবল—এ কী?

সেই শব্দই আমায় ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল।

মাত্র দশ মিনিটের পরমায়ু

চমকে জেগে উঠে ভাবলাম, কী হয়ে থাকতে পারে? কাশ্মীর প্রিন্সেসের সকলেই সচকিত হয়েছিলেন বিস্ফোরণের শব্দে। মিস্ বেরী, ডি-সুজা আর পিমেণ্টা গ্যালিকে তখন গুছিয়ে তুলছিলেন। তাঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন বিস্মিত হয়ে: কিসের এই বিস্ফোরণ? ডি-কুন্হা বিপদসঙ্কেতের সব ব্যবস্থাপনা আর এঞ্জিনের সব ডায়ালগুলো মনোযোগসহকারে পরীক্ষা করে দেখে নিলেন, বিশ্বস্ত এঞ্জিনগুলো নির্দোষ আছে কি না। জাতার আর দীক্ষিত পরস্পরের দিকে মুহূর্তেক দেখে নিলেন, আর পাঠক নির্দেশের প্রতীক্ষায় পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। শব্দটার উৎপত্তি কোথায় খুঁজে দেখার জন্যে পাঠকের দিকে ফিরে জাতার আদেশ দিলেন। এক ঝলকে তাঁদের স্মরণ হল, হংকংএ শোনা স্যাবোটাজের গুজব। তখন এঁরা কেউই তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি।

বিস্ফোরণের সেই জোর আওয়াজে যাত্রীদের কলগুঞ্জন নীরব হয়ে গেছে, আর কয়েক মুহূর্ত পূর্বেকার আনন্দের ওপরে গভীর আতঙ্কের ছায়াপাত হল। তখনো ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে ছিল আমার চোখ। নিশ্চল হয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়েই চিন্তা করছিলাম, কুলক্ষণে শব্দটা কোথা থেকে এসে থাকতে পারে? আমি ঠিক করতে পারছিলাম না, কিছু ভারী জিনিস কেবিনের মেঝেতে পড়ল, না কি, আমি স্বপ্নের ঘোরে শব্দটা শুনলাম।

পরমুহূর্তে সজাগ হলাম, কে যেন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। ফিরে দেখি, একজন চীনা প্রতিনিধি বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। স্পষ্ট সঙ্কেত পেলাম যে, সব কিছু যথাযথ নেই। চীনা ভদ্রলোকের কাছে বিস্ফোরণের সত্যতা যাচাই করার মানসে প্রায় মুখ

খুলেছিলাম, কিন্তু তাঁকে এতক্ষণ নীরব থাকতে দেখে বুঝলাম যে, তিনি ইংরিজী জানেন না। প্রশ্নোত্তরের চেষ্টায় বৃথা কালক্ষয় হবে। যদি বিস্ফোরণই হয়ে থাকে, এখনি কিছু করা প্রয়োজন। অন্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা যাক। ভগবান, কাউকে প্রশ্ন করে আর জানবার দরকার ছিল না। 'শীতল বাতাস নির্গমনের' যে পথগুলি ছিল তার মধ্যে দিয়ে সাদাটে ধোঁয়া কেবিনে এসে পড়ছিল। বিস্ফোরণ অতি-বাস্তব! এখন আমার মনে ঝলসে উঠল বিদ্যুতের মতো হংকং-এর অফিসারটির কথা। বুঝলাম, তিনি আমায় কিসের জন্যে সাবধান করছিলেন। কেউ একটা মারাত্মক টাইম্ বম্ব রেখে দিয়ে থাকবে আর এখন সেটির বিস্ফোরণ ঘটল। আমার মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল পিছনের মালপত্র রাখার ঘরে বিস্ফোরণটি ঘটে থাকবে। দেখবার সুবিধের জন্যে তৈরি কাঁচের জানলা দিয়ে দেখে নিয়ে সে বিষয়ে নিশ্চিত হব কি না ভাবছিলাম। কিন্তু, না—স্বল্পতম বিলম্বে সর্বনাশ হবে। সব যাত্রীরা মালপত্রের ঘরের ঠিক ওপরেই বসেছিলেন। ও ঘরের ছাদই এ কেবিনের মেঝে। যদি কোনোক্রমে আগুন মেঝে ভেদ করে ওঠে, তাহলে আয়ত্তের বাইরে ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছাড়াও যাত্রীদের আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। আর, বিপদের সময়ে আতঙ্কের চেয়ে মারাত্মক আর কিছু নেই।

এ সবই আমি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিলাম। বিদ্যুৎবেগে কক্‌পিটে পেঁৗছে রিপোর্ট করলাম, 'ক্যাপটেন জাতার, পেছনের মালপত্রের ঘরে সম্ভবত আগুন লেগেছে।' দ্বিধামাত্র না করে জাতার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিশ্বাসে ভরা শান্ত স্বরে ডি-কুন্‌হাকে বললেন, এমার্জেন্সি ডিপ্রেসারাইজেশন (জরুরী অবস্থায় স্থানবিশেষের চাপ কমানো) করতে, আর মালপত্রের ঘরে আগুন নিভিয়ে ফেলতে।

কক্‌পিটের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আমি ডি-কুনহাকে সাহায্য করতে লাগলাম। ভারী 'লিভার'গুলোকে নড়ানো বেশ কষ্টসাধ্য। ডি-কুন্‌হা কার্বন ডায়োক্‌সাইড নিয়ন্ত্রণের কনট্রোল খুলে দিলেন পেছনের

মালপত্রের ঘরের আগুন নেভাতে। ক্যাপটেন জাতারকে এই কাজ সমাধা হওয়ার খবর জানালেন।

পাঠক কক্‌পিটে ছুটে এলেন, আর খবর দিলেন, 'আগুন ডানদিকের পাখায়।' পাঠক এ কথা উচ্চারণ করতে না করতেই আমি জাতারের নির্দেশের অপেক্ষা না করে, কেবিনে ছুটে গেলাম ঠিক কোনখানে কতটা আগুন লেগেছে দেখবার জন্যে। পেছনের মালপত্রের ঘরে আগুন নেভাবার চিন্তা ত্যাগ করলাম। ওখানে যদি কোনো আগুন থেকেও থাকে তা এতক্ষণে নিভে গেছে। সবচেয়ে ভেতরের দিকের পেট্রল ট্যাঙ্কের ঠিক পেছনেই আগুন জ্বলছিল, আর অত্যন্ত দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। আমি ক্যাপটেন জাতারের কাছে ছুটে ফিরে গেলাম আর আগুনের যথার্থ অবস্থান বর্ণনা করলাম। আগুনের স্থান বা ব্যাপ্তির কথা জানতে জানতেই ওঁকে আমি বললাম, "ক্যাপটেন জাতার, যথাসম্ভব শিগ্গির 'ডিচ্' (জলে নামিয়ে ফেলা) করাই এখন একমাত্র উপায়।" ইতিমধ্যে ডি-কুন্‌হা ক্যাপটেন জাতারকে জানালেন যে হাইড্রলিক ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছে।

ক্যাপটেন দীক্ষিত আমার কাছে আগুনের অবস্থান আর ব্যাপ্তির কথা জানতে পেরেই কঠিন কণ্ঠে বললেন, "ওরা আমার দফা শেষ করেছে।" নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যে, এ হল অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের পরিণতি। ক্যাপটেন জাতারকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "মে-ডে সিগনাল পাঠাব কি?" (অন্তিম বিপদের সময়ে সাহায্যপ্রার্থী সঙ্কেতের নাম মে-ডে)।

"না, এক মিনিট অপেক্ষা করো। তুমি কনট্রোলটা নাও। আগুনের অবস্থাটা কত খারাপ একবার নিশ্চিত হয়ে আসি।" ইতিমধ্যে বিমানটাকে সরাসরি নিচের দিকে নামাতে দীক্ষিত স্বয়ংক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থার সুইচ বন্ধ করে নিজেই বিমানকে নিচের দিকে নামাতে লাগলেন।

জাতার সীটের থেকে উঠে কেবিনে গেলেন আগুনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে বুঝতে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জাতার নিজের আসনে ফিরে এলেন, "ডিকি, মে-ডে সিগনাল পাঠিয়ে দাও।" আগুনকে একনজর দেখেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, টাইম বম্বখানা পেট্রল ট্যাঙ্ক ছিদ্র করে দিয়েছে। নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প।

বিমান মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জলেই একে নামিয়ে ফেলতে হবে। বিস্ময়জনক প্রশান্তভাবে তিনি কণ্ট্রোলের দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। মনে হল, তাঁর স্নায়ুতন্ত্রী যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরী।

দীক্ষিত মাইক্রোফোন তুলে নিলেন ; শান্ত কণ্ঠে বললেন : "ভিক্টর একো পাপা কলিং···মে-ডে···মে-ডে···মে-ডে···।" ক্যাপটেন জাতারের কাছে তিনি জানতে চাইলেন, সূচনায় জানাবেন কিনা যে অন্তর্ঘাতী কাজ বলে ওঁরা সন্দেহ করছেন, আর ডানদিকের পাখায় আগুন লেগেছে···

ঠিক তখনি ব্যগ্রকণ্ঠে জাতার বললেন, "ডিকি, কনট্রোলগুলোয় আমায় একটু সাহায্য করো। এলিরন্ কন্ট্রোলটাকে বাঁপাশ করে ওপরের দিকে জোরে ধরো আর বাঁয়ের রাডার প্যাড্ল্‌টাতে আর একটু চাপ দাও।"

দীক্ষিতের সব শক্তি একাগ্র করতে হল কাশ্মীর প্রিন্সেসকে সংযত রাখার কাজে ক্যাপটেন জাতারকে সাহায্য করতে। আরো কোনো বিজ্ঞপ্তি পাঠাবার কল্পনা দীক্ষিতকে পরিহার করতে হল।

পর্যবেক্ষণের সেই জায়গায় আমি ফিরে চললাম। মালপত্র রাখার একটি ঘরে আগুন লেগেছে সন্দেহ ছিল বলে, আমি দেখে নিলাম অন্য মালপত্রের ঘরটিতে আগুনের চিহ্ন আছে কি না।

হিংস্র বহ্নি তখন বিমানের এমন জায়গায় জ্বলছিল যে তাকে নেভানোর কোনো উপায় ছিল না। শিখাগুলো উন্মত্তভাবে সারা বিমানে ছড়িয়েই পড়তে থাকবে আর সমস্ত কর্মী আর যাত্রীদের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর কবলে গ্রাস করবে।

এ আগুনকে অবদমিত করার কোনো পথ ছিল না, এর হ্রাস পাবার কোনো ইঙ্গিত নেই, কাছাকাছি কোনো অবতরণের ঘাঁটি ছিল না

(নিকটতম সিঙ্গাপুর ৩৫০ মাইল দূরে)। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র পরিত্রাণের পথ—জলের ওপরে যথাসম্ভব শিগগির বিমানটিকে এনে ফেলা। ক্যাপটেন জাত্তার 'ডিচ্' করার সিদ্ধান্তই নিলেন।

বিমানকে জলে নামানো আর লাইফ-জ্যাকেটএর ব্যবস্থা একই সঙ্গে হওয়ার কথা। পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র থেকে ফেরার পথে আমি মনে করেছিলাম ডি-সুজা, পিমেণ্টা আর বেরী সব যাত্রীদের লাইফ-জ্যাকেট পরিয়ে দেবার ব্যাপারে সম্ভবত ক্যাপটেনের আদেশের প্রতীক্ষা করে আছেন। বিমানখানা ডিচ্ করার সিদ্ধান্তের কথা ওঁদের জানানো উচিত। কেবিনের দরজা খুলতেই আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত যাত্রীদের দিকে ফিরে তাকাবার এক মুহূর্তও অবকাশ হয় নি। তাঁরা সকলে শান্ত হয়ে নিজের নিজের আসনে বসে ছিলেন আর প্রত্যেকেই লাইফ-জ্যাকেটে সজ্জিত। বেরী, ডি-সুজা আর পিমেণ্টার পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসার্হ যে তাঁরা ক্যাপটেনের প্রথাগত প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষা করে না থেকে সব যাত্রীদের জ্যাকেট বিতরণ করে দিয়েছেন। সকলেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত ধারণা ছিল যে, যে যার নিজের কাজ করে যাবে, এটাই ক্যাপটেনের প্রত্যাশা। আর সকলেই আশানুরূপ ব্যবহার করলেন।

আবার আমি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে এলাম—জানলাখানি ডানদিকের পাখার ঠিক সামনে। সেই ভয়ঙ্কর আগুন পাখাটিকে গ্রাস করে চলেছে। পীত লোহিত ক্রমবর্ধমান শিখার দল অসম ছন্দে তাদের মৃত্যুতাণ্ডব শুরু করেছে। পাখার শক্ত অ্যালুমিনিয়াম কাগজের মতো পুড়ছিল, পাখার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে খসে যাচ্ছিল, আর নীচের বায়ুস্তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। সেই সর্বগ্রাসী আগুনকে শুধু দেখা ছাড়া আর কিছুই আমার করার ছিল না।

আমি আতঙ্কিত মনে জানলার বাইরে চেয়ে রইলাম। আগুন এখন সবচেয়ে ভেতরের দিকের পেট্রল ট্যাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

অনতিবিলম্বে ট্যাঙ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠবে; অন্তরস্থ ভয়ানক উত্তপ্ত পেট্রল একে ফাটিয়ে দেবার মতো তাপমানে উপস্থিত হবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে আর নিমেষে সকলকে সংহার করবে। তা যদি নাও ঘটে, বিস্ফোরণ পাখাটিকে উড়িয়ে দেবে আর তারই জন্যে বিমানখানি প্রবলবেগে ঘুরতে ঘুরতে টুকরো টুকরো হয়ে জলে পড়বে। যে কোনো পরিণতিতেই মৃত্যু অবধারিত বোধ হল। পরিত্রাণ অসম্ভব। এমন নিশ্চিতভাবে পরিণামের কথা বিমানে আর কেউ জানতে পারছিল না। আমি অনুভব করলাম এই দৃশ্য দেখার অংশভাগী হতে কারোকে ডাকা নির্বুদ্ধিতা হবে। পরিণতি যতই অবশ্যম্ভাবী হোক, আশা ত্যাগ করা উচিত নয়। আর আশা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম চলতে থাকে, বিরুদ্ধতা যতই হোক না কেন। বিমানের গতির জন্যে বাতাস শিখাগুলোকে আরো সঞ্জীবনী জোগাচ্ছিল, অতএব আর বিমানকে বাঁচানোর জন্যে গতি হ্রাস করাও অযৌক্তিক।

ক্রমবর্ধমান আগুনের দিকে আমি চেয়ে রইলাম। তাহলে এই আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত, এক জ্বলন্ত ধ্বংসোন্মুখ বিমানে। পরিবারের কারো সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। বরং তারা কেউ আর কখনও আমায় দেখতে পাবে না। সামনের রক্তিম পটভূমিতে আমি পরিবারস্থ প্রত্যেককে আর আমার বাগ্‌দত্তাকে যেন দেখতে পেলাম।

হয়তো এক মিনিট কিংবা দু-মিনিট কেটে গেছে, আগুন ট্যাঙ্কে এসে পৌঁছানোর পরে। এতক্ষণে বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার কথা। ফেটে যাওয়ায় বাধা দিচ্ছে কিসে, তাই আমি চিন্তা করছিলাম। এমন হওয়া সম্ভব যে ট্যাঙ্কে ছিদ্র হয়ে গেছে তাই ওর ভিতরে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি হতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, প্রথম বিস্ফোরণেই ট্যাঙ্কে ছিদ্র হয়ে থাকবে। তা না হলে আগুন এত দ্রুত বিস্তৃত হত না।

কেবিন আর পাখার সংযোগস্থলে এতক্ষণে আগুন এসে পৌঁছাল।

আগুন মাথা তুলে জানলা পর্যন্ত উঠেছে, আর পাখাটি দেখা যাচ্ছে না। আমি ভেতরেই উত্তাপ অনুভব করতে পারছিলাম। আগুন এবার কেবিনকে জ্বালিয়ে দিতে শুরু করবে। আমি শুধু আশা করছিলাম, কেবিনটি গলতে শুরু করার আগে পুরোপুরি চাপশূন্য করা হয়ে যাক (কারণ বিশেষ বায়ুচাপে রক্ষিত কেবিনে কোন ফাঁক পেলেই সহসা চাপের হ্রাস যাত্রী বা কর্মীদের সকলের কানের ড্রামকে নষ্ট করে দেবে)। বহ্নিশিখা তার রক্তিমতা কেবিনের মধ্যেও প্রসারিত করে দিল, তখন সমস্ত কেবিনটা যেন জ্বলন্ত এক চুল্লী। আসনের সাদা ঢাকনাগুলো আরক্তিম হল আর শোণিতপিপাসু শিখাগুলো কেবিনের সবকিছুকে রক্তাভায় পরিস্নাত করে দিল। মাত্র ইঞ্চিকয়েক ব্যবধান, অগ্নিশিখা ক্রমাগতই নিকটবর্তী হয়ে আসছে।

বেসামাল বিমানের কণ্ট্রোলে জাভার আর দীক্ষিত যুদ্ধ করে চলেছেন। এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে বিমানকে আয়ত্তে রাখা দুঃসাধ্য। বিস্ফোরণের পরেই হাইড্রলিক ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ায় কণ্ট্রোলগুলো নাড়াচাড়া অনেক বেশী শক্তিসাধ্য হয়ে পড়েছে। প্রতিমুহূর্তে ডানদিকের পাখার আয়তন কমে আসছে; তার জন্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে বিমানটিকে সোজা পথে সমতা রেখে চালনা করা অসম্ভব হয়ে গেছে।

পাঠক পাইলটদের পিছনে দাঁড়িয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে সামনে তাকিয়ে আছেন নাতুনা দ্বীপপুঞ্জের সন্ধানে, যেখানে 'ডিচ্' করার স্থান নির্বাচিত হয়েছে। ডি-কুন্‌হা অবিরত নিম্নগামী বিমানে ক্রমাগত বায়ুচাপ হ্রাসের, আর ইঞ্জিনের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার দুষ্কর কাজে সদা সতর্ক। মরণনৃত্যরত শিখার বেষ্টনীতে ইস্পাতদৃঢ় মনোবল নিয়ে যাত্রীরা স্ব স্ব আসনে বসে রইলেন। মিস্ বেরী, ডি-সুজা আর পিমেন্টা যাত্রীদের সাহস দেবার জন্যে সঙ্গেই রইলেন।

সহসা আমার মনে উদয় হল কক্‌পিটে কর্মীরা লাইফ-জ্যাকেটে সজ্জিত নাও হয়ে থাকতে পারেন। আমি তিনটি লাইফ-জ্যাকেট নিয়ে

(একসঙ্গে তিনটির বেশী নেওয়া যায় না বলে) সামনের দিকে ছুটে গেলাম। আমি নেভিগেটরের ঘরে এগুলিকে রেখে আরো তুটির জন্যে কেবিনে ফিরছিলাম, দরজা খুলেই দেখি মিস্ বেরী আরো তিনটি লাইফ-জ্যাকেট নিয়ে কক্‌পিটের দিকেই আসছেন। ভাবলেশহীন সাদা তাঁর মুখ। আমার দিকে চাইলেন না। শুধু সামনের দিকে চোখ মেলে রইলেন। কর্তব্যবোধের ইশারায় কাজ করলে সাধারণতই অনুপ্রাণিত নয়, কেমন যেন যান্ত্রিক দেখায়। তাঁকে এমন কঠোর দেখাচ্ছিল যে আমি তাঁর মুখের দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারলাম না। আমি শুধু তাঁর জন্যে কেবিনের দরজা খুলে ধরলাম আর তারপরে তাঁকে কক্‌পিটে অনুসরণ করে এলাম। একটা জ্যাকেট দিলাম পাঠককে আর অন্যটা ডি-কুন্‌হার দিকে বাড়িয়ে। ডি-কুন্‌হা জ্যাকেটটা গলায় পরে নিলেন। তাঁর হাত তুটো কাজে নিযুক্ত থাকায় আমি কাছে গিয়ে ওঁর কোমরের স্ট্র্যাপটা বেঁধে দিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি আমার জ্যাকেটটাও পরে নিলাম।

গ্লোরিয়া পাইলট তুজনের কাছে জ্যাকেট নিয়ে উপস্থিত হলেন। তুজন চালকই তখন এমন নিদারুণ বিরূপতার মুখোমুখি—অর্ধদগ্ধ একখানা পাখা নিয়ে বিমানখানা নিয়ন্ত্রণের অতীত, পাক খেয়ে চলেছে ; সারা কক্‌পিট আর কেবিন এমন ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন যে ওঁদের পক্ষে লাইফ-জ্যাকেটের মতো তুচ্ছ ব্যাপারে মনোযোগের ভগ্নাংশও ব্যয় করা অসম্ভব। একটি লক্ষ্যে তাঁদের মন নিবিষ্ট—জলের ওপরে বিমানটিকে যথাশীঘ্র নামিয়ে ফেলা। গ্লোরিয়া তা বুঝলেন আর চালক তুজনকে জ্যাকেট পরিয়ে দেবার সঙ্কল্প করলেন। ওঁরা নিজেরা জ্যাকেট পরে নিতে পারবেন না, এ কথা মনে হওয়া মাত্রই তিনি এগিয়ে গেলেন। একটি দীক্ষিত আর অন্যটি জাতারের গায়ে চড়িয়ে দিয়ে বললেন, "দয়া করে এগুলে পরে নিন।" ত্বরিতে জ্যাকেটের স্ট্র্যাপগুলো বেঁধে দিলেন। সকলের জ্যাকেট পরা হয়ে যাবার পরই তিনি নিজে পরলেন। এক কঠোর কর্তব্যবোধের দীপ্তিতে উজ্জীবিত তিনি, অকম্পিত পদক্ষেপে ঘন-কালো ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে কেবিনে চলে গেলেন।

ক্যাপটেন জাতার ভাবলেন ঠিক জলে নামার আগে ওঁদের যথার্থ অবস্থানটি জানিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। নাতুনা দ্বীপপুঞ্জের ওপর থেকে ওঁদের শেষ স্বাভাবিক সূচনা পাঠানো হয়েছিল। তারপর পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। 'মে ডে' সিগনাল পাঠাবার পরই যদি তাঁদের সন্ধানের কাজ শুরু হয়ে থাকে তাহলে উদ্ধারে নিযুক্ত দল 'ডিচিং'-এর জায়গা থেকে অন্যদিকেই নির্দিষ্ট হবে সম্ভবত। আগুন জ্বলে ওঠার পর 'ডিচ্' করা শুরু হয়ে থেকে ক্যাপটেন জাতার কাশ্মীর প্রিন্সেসকে গ্রেট নাতুনা দ্বীপের যথাসম্ভব কাছাকাছি জলে নামানোর জন্যে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এইসব চিন্তা করে তিনি দীক্ষিতকে বললেন : "ডিকি, আমাদের এখনকার অবস্থান বেতারে পাঠিয়ে দাও আর ওদের বলো যে আমাদের বিমানে স্যাবোটেজ করা হয়েছে।"

দীক্ষিত তৎক্ষণাৎ ডানদিকের হুক থেকে মাইক্রোফোনটি তুলে নিলেন আর বোতামে চাপ দিলেন। যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়ে থাকবে কারণ স্বাভাবিক গুঞ্জন শোনা গেল না। সুইচটি ছেড়ে দিয়ে আবার চাপ দিলেন। রেডিও কি নষ্ট হয়ে গেছে ? তবু মাইক্রোফোনে কথা বলতে চেষ্টা করলেন তিনি। 'ভিক্টর একো পাপা কলিং··· মে ডে···' তিনি বুঝতে পারলেন যে এখন আর্ত সূচনা পাঠানো অসম্ভব। আগুনের জন্যে বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি জাতারকে জানালেন, "ক্যাপটেন, রেডিওটা গেছে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও একবারে খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়।"

এমন আগুনে যে কোনো অংশই বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। ক্যাপটেন জাতার ডি-কুন্‌হাকে আদেশ দিলেন, বিদ্যুৎ জেনারেটরগুলোর সুইচ বন্ধ করে দিতে আর মাত্র একটি কথা বললেন, "দেখা যাক, আশা করতে দোষ নেই··· ।"

আমি ক্যাপটেন জাতারের কাছে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আগুনের তৎকালীন অবস্থাটা বর্ণনা করলাম। "ক্যাপটেন জাতার, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাখাটা খুলে পড়ে যেতে পারে।" ক্যাপটেন

শুধু তার উত্তরে শান্ত অবিচলিত স্বরে জানালেন, "আমরা ডিচ্ করছি।"

আগুন দেখার জন্যে কেবিনে ফেরা নিরর্থক কারণ শিখার সারি ছাড়া জানালা দিয়ে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এখন আরো একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য বাকি আছে আমার। জরুরী অবস্থায় নির্গমনের জন্যে তৈরী জানালা আর দরজাগুলো খুলে দিতে হবে। কোনটির পর কোন জানালাটিকে খুলব তা আমি ইতিমধ্যে মনে মনে স্থির করে রেখেছি। জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের এই জানালাগুলি খোলার একটা বিধিবদ্ধ ক্রমানুসার আছে। তদনুযায়ী খুললে কেবিনে যদি কোনো ধোঁয়া থাকে তা দূর হয়ে যায়। আমি এগুলি খুলে ফেলার আদেশের অপেক্ষায় ছিলাম। কেবিন সম্পূর্ণভাবে 'ডি-প্রেসারাইজড্' হলেই সে আদেশ দেওয়া হবে।

আদেশের প্রতীক্ষায় যখন দাঁড়িয়েছিলাম তখন ডি-কুন্হা উত্তেজিত ভাবে ক্যাপটেন জাতারকে সংবাদ দিলেন, তিন নম্বর ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে। অগ্নি-সাঙ্কেতিক ব্যবস্থার নির্দেশ থেকেই এ খবর জানা গেছে। সকলেই জানতাম যে এ আগুন ইঞ্জিনের নয়। বাইরের আগুন ইঞ্জিন পর্যন্ত ছড়িয়েছে। ক্যাপটেন ইঞ্জিন বন্ধ করার আর আগুন নেভাবার নির্দেশ দিলেন। আমার মুখে এসে পড়েছিল যে ক্যাপটেনকে বলি, ইঞ্জিন বন্ধ করে কাজ নেই। কারণ ইঞ্জিন বন্ধ করলেই বিমানের এই পাক খাওয়া আরো বেড়ে যাবে। পর মুহূর্তে মনে হল, বিমানের অসংবদ্ধ ব্যবহার সহ্য করা বরং ভালো, আরো বিশ্রী অগ্নিকাণ্ডের চেয়ে। আগুন ইঞ্জিন পর্যন্ত পৌঁছেছে আর ইঞ্জিন এখন বন্ধ না করলে আগুনে সত্যি সত্যিই ইন্ধন পড়বে। পাম্পের থেকে পেট্রল ছিটিয়ে দেবে। ক্যাপটেনের আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর বাকি কার্বন-ডাইঅকসাইডের আধারগুলোকে ইঞ্জিনের গায়ে খালি করে দেওয়া হল। তবু আগুন বিন্দুমাত্র প্রশমিত হল না। পরে সাবধানবাণী এল ডানদিকের কেবিন হীটার থেকে (প্লেনের পেটের

কাছে, ডানার শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে দুটি 'হীটারের' ব্যবস্থা আছে দুদিকে, কেবিনে গরম বাতাস পাঠাবার জন্যে)। এতক্ষণে আগুন কেবিন হীটার ইউনিটে, অর্থাৎ বিমানের দেহে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু কার্বন-ডাইঅক্-সাইড তখন আর নেই। কিছু করবার আর ছিল না। আর যদি বা কার্বন-ডাইঅকসাইড থাকত তাহলেও তা এই প্রচণ্ড আগুনের সামনে নিরর্থক হত। বিমানের সাধারণ অগ্নিনিবারক ব্যবস্থার পক্ষে এ আগুন অনেক বেশী। যাঁরা এ বিমান পরিকল্পনা করেছেন তাঁদের পক্ষে এত আগুনের আশঙ্কা করতে পারা সম্ভব নয়, বিশেষত যে জায়গায় আগুন লেগেছে। নক্শা করার সময় তাঁরা ভেতরে যেখানে আগুন লাগতে পারে এমন সব জায়গার জন্যেই নির্বাপক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই আগুন লেগেছে অস্বাভাবিক জায়গায় আর অসাধারণ বেশী। নির্মম ভাবে আগুন পাখার ওপর ছড়িয়ে চলেছে, যেমন বাঁধ ভেঙে ফেলতে পারলে নদী বেয়ে চলতে চায়।

বিপদ্কালীন জানলাগুলি খোলার আদেশ পাবার অপেক্ষায় কক্পিটে বড়োজোর মিনিটখানেক দাঁড়িয়েছি, ডি-কুন্হা ক্যাপটেনকে সংবাদ দিলেন যে কেবিনটি সম্পূর্ণরূপে ডি-প্রেসারাইজড। আমি কেবিনে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়ালাম, তখন ক্যাপটেন জাতারের আদেশ এল : "কারনিক্, এমারজেন্সি পথগুলো খুলে দাও!"

জলের সঙ্গে বিমানের সংঘাত হবার পূর্বেই জানালাগুলি খোলা প্রয়োজন। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক ও দক্ষ অবতরণের সময়েও বিমানখানি বেঁকেচুরে যায় আর এমন ভাবে দরজা-জানলাগুলি বেধে যায় যে খোলার উপায় থাকে না। স্বাভাবিক অবতরণের সময়, ধাক্কা সহ্য করার জন্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত চাকায় বেশীর ভাগ আঘাত সয়ে নেয়, কিন্তু জলের ওপর অবতরণের সময় চাকা বা আঘাত সহ্য করার অন্যবিধ ব্যবস্থা কিছুই কানে লাগে না, সারা বিমানটির সংঘর্ষ হয় জলের সঙ্গে, আর ফলত জানালা-দরজাগুলো বেধে যায়

জাতারের আদেশমাত্রই আমি কেবিনে ছুটে গেলাম। কেবিন তখন ফুটন্ত চুল্লি। রক্তরাঙা, আর নিদারুণ গরম। ডানদিকের জানলায় আগুনের শিখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

সবচেয়ে আশ্চর্য যে, পাখাটি তখনো বিমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। তখনো ওই পাখায় 'লিফট' দিচ্ছে, যদিও অনেক কম। বাঁ দিকের পাখা অবিকৃত অবিকল রয়েছে তখনো। এই কয়েক মুহূর্ত বিমানে প্রত্যেকেই তপ্ত তীব্র মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছে। দুরাশার মধ্যেও প্রাণ ধারণের ইচ্ছে নিয়ে তার সঙ্গে যুঝেছে। এই মুহূর্তে, সকলেই জীবন্ত। আর কয়েক মুহূর্ত পরে সব পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সম্ভবত কেউই জীবিত থাকবে না। তবু আমার আশা ছিল, বিমানখানা কয়েক মিনিট হয়তো ভেসে থাকবে। এমনকি মিনিট তিনেক ভেসে থাকলেও সকলের প্রাণরক্ষা সম্ভব। বাঁ দিকের পাখায় আগুন না লেগে ডানদিকে লাগায় তবু ভালো হয়েছে, আমার মনে হল। বাঁ দিকের ডানার কাছে দুটি (লাইফ-বোট) নৌকা বাঁধা আছে, আর ডানদিকে মাত্র একটি। কেবিনের কাছেই ইঞ্জিনের পেছনে লাইফ-বোটগুলি থাকে। ডানদিকের নৌকা ইতিমধ্যে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে।

বাঁ দিকের পাখার ওপরে সেই এমারজেন্সি জানলা খোলার 'লিভারে' হাত দিলাম। চাবি খুলে তাকে ভেতরে টান দেবার চেষ্টা করলাম। সাধারণ শক্তিতে সে নতিস্বীকার করতে চাইল না। বন্ধই রইল। অর্থাৎ বাইরের বাতাসের চেয়ে বিমানের ভেতরের চাপ তখনো বেশী, তাই জানলাটি এমন শক্তভাবে এঁটে রয়েছে। মুহূর্তমাত্র অপব্যয় করা চলবে না। সমস্ত শক্তি একাগ্র করে ধাক্কা দিলাম। জানলাটা খুলল। ভেতর থেকে এক ঝলক বাতাস বেরিয়ে গেল। কর্মীরা সময়মত যাতে বাইরে যেতে পারে তাই তারপরেই নেভিগেটর-এর কেবিনের জানলা খুলে ফেলা স্থির করলাম। আর সেটিকে খুলে ফেলার পর আমার ইচ্ছে ছিল পেছনের দিকে ছুটে গিয়ে কেবিনের প্রধান দরজাটা খুলে ফেলব।

কেবিনের এমারজেনসি এক্সিট্ খুলে ফেলার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাইরে থেকে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া প্রবেশ করতে লাগল।

কয়েক সেকেণ্ড আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। এমন ঘটবার কারণ হল এই যে, আগুন তখন বাঁ দিকের পাখাতেও ছড়িয়ে পড়েছে আর বিমানখানা ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এই অপ্রত্যাশিত বিপদের হাত থেকে রক্ষার উপায় নির্ধারিত পরবর্তী কর্তব্যগুলো অতি সত্বর সমাধা করে ফেলা। আমি নেভিগেটের-এর ঘরে এসে তার এমারজেন্সি এক্সিট মুক্ত করে দিলাম। জানলার খিলের থেকে হাত সরিয়ে নেবার আগেই আমার বোধ হল বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে যাবে। ঘন কালো ধোঁয়া সব আশঙ্কার চেয়েও দ্রুতবেগে আমায় অনুসরণ করে কেবিনে এসে উপস্থিত হয়েছে। কেবিনের দিকে চাইলাম। শ্বাসরোধকারী ঘন কালো ধোঁয়ায় কেবিন আচ্ছন্ন। 'ডিচিং'-এর আশা মন থেকে মুছে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিমানের সব আরোহীরা দমবন্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে আর অনিয়ন্ত্রিত বিমান জলে গিয়ে পড়বে। কিছু করার ক্ষমতাও ছিল না। প্রাণদায়ী অক্সিজেনের অভাবে বোধ হল পঙ্গু হয়ে গেছি ; হাতগুলো অবশ হয়ে আসছে, চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, পা দুটো আর বইতে পারছে না। জীবন রক্ষার জন্যে যুঝবার শক্তিও আর ছিল না, পাদুটো দেহকে বহন করতে অস্বীকার করছে আর হাতদুটো কোনো অবলম্বন আশ্রয় করতেও পারছে না। এক-বুক নির্মল বাতাস আমার সব শক্তি যেন ফিরিয়ে দিত পারত, আর কেবিনের দরজা খোলার জন্যে ছুটে যেতে পারতাম।

দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ধোঁয়া তখন কেবিন ভরে ফেলেছে। বিমানের কোথাও ছ ইঞ্চি দূর পর্যন্ত দেখতে পাবার অবস্থা ছিল না। দীক্ষিত আর জাতার তারই মধ্য দিয়ে কোনোক্রমে দেখার চেষ্টা করছিলেন। দ্বীপপুঞ্জের গায়ে ছোট ছোট পাহাড় ছিল। বিমানের গতি মন্থরতর হওয়া তখন সবচেয়ে শঙ্কাজনক। দীক্ষিত গতিনির্দেশক মিটারে প্রায়

নাক ছুঁইয়ে ঝুঁকে পড়লেন, বিমানের বেগ যথেষ্ট আছে কিনা দেখার জন্যে। ডি-কুন্‌হার পক্ষে এঞ্জিনের শক্তি-সম্পর্কিত যন্ত্রাবলী দেখার উপায় ছিল না ; সবকিছু ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। কোথাও থেকে অল্প বাতাস আসতে দেওয়াই তখন পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। ডি-কুন্‌হার সহসা মাথায় এল যে কক্‌পিটের সামনের জানলাটা খুলে দিলে সকলের প্রাণ রক্ষা হতে পারে। তিনি দীক্ষিতকে বললেন : "ডিকি ডিকি, তোমার পাশের জানলাটা খুলে দাও।" আরো দু-একবার তাঁকে বলতে হল, তিনি শুনতে পেলেন না। জাতার শুনতে পেয়ে দীক্ষিতকে বললেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ অনুযায়ী জানালাটা দীক্ষিত খুলে দিলেন। নির্মল এক ঝলক বাতাসে কক্‌পিট আর নেভিগেটর-এর ঘরের সব কর্মীদের কর্মক্ষমতা আবার ফিরিয়ে দিল। জানলা খুলতে আর কয়েক মুহূর্তের বিলম্বে সকলে নিশ্চিতই শবে পরিণত হত।

কো-পাইলট দীক্ষিতের সামনের খোলা জানলা শুধু যে বাতাস এনে দিল তাই নয়, এখন দুজন পাইলটই বাইরে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন আর অপেক্ষাকৃত সহজে বিমান পরিচালনা করতে পারছিলেন।

"ডিকি, তুমি বাতাসের বেগটা লক্ষ্য করো", ক্যাপটেন জাতার বললেন।

এবার হয়তো আমি বিমানটিকে ধীরে ধীরে জলের ওপর নামিয়ে ফেলতে পারব, ভাবছিলেন ক্যাপটেন। তিনি জানতেন যে এ প্রায় সম্ভাবনার অতীত। তবু তাঁর ইস্পাতদৃঢ় মনোবল, গভীর আত্মপ্রত্যয় আর শান্ত সমাহিত কর্মোদ্যম তাঁকে যেন প্রেরণা দিচ্ছিল : যে কোনো পাইলটের পক্ষে কঠোরতম বিপত্তিতে যথাসাধ্য করে যাচ্ছিলেন তিনি।

শ্বাসরোধ হয়ে তখন আমার প্রায় পড়ে যাবার অবস্থা। কক্‌পিটের খোলা জানালা দিয়ে নতুন ঠাণ্ডা তাজা বাতাসে বুক ভরে নিয়ে নবজন্ম লাভ করলাম। নেভিগেটরের টেবিল ডান হাতে চেপে ধরলাম। আমি জানতাম আবার আমার পা দুটো শরীরের ভার বহন করতে পারবে। অন্ধত্ব অপসারিত হল আর আবার আমি সচেতন হলাম বাস্তবের

সম্পর্কে—কঠোর আর অপরিজ্ঞাত বাস্তব। কালো ধোঁয়ার রাশ তখনো এগিয়ে আসছে। তখনো চারিপাশ ছেয়ে আছে। পা দুটো প্রস্তুত হয়ে আছে মস্তিষ্কের কাছ থেকে পরবর্তী প্রত্যাদেশের অপেক্ষায়। হ্যাঁ—কেবিনের প্রধান দরজাটা তখনো খুলে ফেলা হয় নি। চোখ চেয়ে, সামনে এমারজেন্সি একসিটের ফাঁকা পথটিকে দেখলাম। সর্বনাশ, আর মাত্র কয়েক ফুট নিচেই সমুদ্র। কেবিনের দরজা খুলে ফেলতে পারি নি বলে দুঃখ বোধ হচ্ছিল। কারণ, জল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিমানখানা তলিয়ে যায় তাহলে বাঁদিকে পাখার ওপরে ওই এমারজেন্সি একসিটে জলের নিচে সাঁতরে এসে পড়া যাত্রীদের পক্ষে ভীষণ কষ্টসাধ্য হবে। কেবল আশা করে রইলাম, ডি-সুজা বা পিমেন্টা ইতিমধ্যে দরজাটা খুলে ফেলে থাকবে।

বিমানের কয়েক ফিট নিচে জল দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কেবিনের দরজা খুলতে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেছি। যে কোনো মুহূর্তে বিমান জলে গিয়ে পড়বে। জলের ওপরে অবতরণের সময়ে প্রত্যেক যাত্রীকে নিজের আসনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে হয়। বাঁধা না থাকলে ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে আঘাত পাবার আশঙ্কা থাকে। কোনো চেয়ার খুঁজে নিজেকে তার সঙ্গে বেঁধে ফেলার সময় আমার আর ছিল না। যাই হোক, যেখানে আছি সেখানেই আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বুঝতে পারছিলাম যে অপেক্ষা করার পক্ষে জায়গাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। এঞ্জিনগুলি এর ঠিক পেছনেই, আর সংঘাত আসন্নপ্রায়; তার ফলে জলের রাশিতে বিমানটি বাধা পাবে কিন্তু ঘূর্ণমান প্রপেলরের সাহায্যে ইঞ্জিনখানা এগিয়ে আসতেই থাকবে। জল স্পর্শ করার সময় বিমানটি অল্পমাত্র বেঁকে গেলেই পাশের ইঞ্জিন আর তার প্রপেলর এই ঘরটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

ঘরটিতে আমি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। অন্যত্র যাওয়ার চেষ্টা তখন অবধারিত মৃত্যুর কারণ হত। জীবন আর মৃত্যুর সঙ্গমে কয়েকটি মুহূর্ত। মনে একটি ধারণা তখন অস্পষ্টভাবে জেগেছিল যে

সম্ভবত মৃত্যু আসবে অতি আকস্মিক, বেদনা বোধ করার সময় পাব না। অজান্তে আমি হাত দুটো জড়ো করে নেভিগেটর-এর টেবিলে রাখলাম আর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তার ওপরে মুখ ঢাকলাম। পর মুহূর্তে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কানে গেল। রাশি রাশি ধাতুর খণ্ড সারা শরীরে ছিটিয়ে পড়ছে, মনে হল। প্রপেলর আমাকে খণ্ডিত করবে কিংবা বিমানের সামনের অংশের সঙ্গে এই কেবিন ভেঙে গেঁথে যাবে এ ভয় আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে চোখ মেলে চাইতে ভরসা পেলাম না। সব জলোচ্ছ্বাস, ধাতুখণ্ডের বর্ষণ আর ঝাঁকানি সহসা স্তব্ধ হল। সমস্ত গতি যেন মুহূর্তের মধ্যে নিথর হয়ে গেল। প্রপেলর বা যন্ত্রপাতি আঘাত করে নি। বর্শার মতো বিদ্ধ করে নি কোনো স্প্লিন্টার। আমি বেঁচে আছি। কিন্তু আর কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারব? অপর সকলের কী হল?

মৃত্যুর কবল থেকে

হালকা সবুজ জলের ঘেরায় আমি চোখ খুললাম। তখন আর বিমানের মধ্যে নয়। বিমানের কোনো অংশও আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এখানের গভীরতা যে খুব বেশী নয় তার ইঙ্গিত জলের এই হালকা সবুজ রঙ। হাতের কয়েক আঘাতেই ভেসে উঠলাম। একরাশ স্প্লিন্টার আর ধাতুর খণ্ড, একটি দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ ফুট—আর কতকগুলি সীটের রবার-কুশন্ আমার সামনে ভাসছিল। পেছনের দিক থেকে ঝলসানো উত্তাপ অনুভব করলাম। সেদিকে ফিরে রুদ্ধশ্বাসে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম। এমন ভয়ঙ্কর কোনো দৃশ্য কখনো দেখি নি, এমন কি সিনেমার পর্দাতেও না। পর্দায় 'ডিচিং' আর বিমান ধ্বংস হওয়ার যে-সব চিত্র দেখেছি এর কাছে তাদের নিতান্ত অপ্রাকৃত আর সাধারণ বলে বোধ হল। কল্পনার চেয়ে বহুগুণ অনর্থের ছিল বাস্তবিক আঘাত। প্রথম সংঘাতে পেট্রলের ট্যাঙ্ক ভেঙে খুলে গিয়ে জলের ওপর তার বিস্ফোরক তেল বিছিয়ে দিয়েছে। জ্বলন্ত ডানদিকের পাখা অগ্নিসংযোগ করেছে তাতে। প্রায় দুশোফুট ব্যাসের এক বৃত্ত, আমার কাছ থেকে মাত্র কুড়ি ফুট দূরে উত্তপ্ত রক্তিম লাভার মতো শিখার রাশি জলের ওপরে ফুলে নৃত্য করছে আর ক্রোধদীপ্ত চোখে চেয়ে দেখছে। আকাশে প্রায় পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত সেই মারাত্মক শিখা জেগে উঠেছে, আর তার থেকে নির্গত হচ্ছে ঘন ধোঁয়ার রাশ। জীবিত আছি শুধু এইটুকু তখন জানতাম। আর কেউ ভেসে নেই। তাদের পরিণামের কথা কল্পনা করতে পারছিলাম না, বিমানের মধ্যেই তারা আবদ্ধ হয়ে গেছে কিংবা প্রজ্বলন্ত আগুনের জালে জড়িয়ে পড়েছে। কিছুই তখন জানি না। জীবিত থাকলেও আমি বিপদের কবল থেকে তখনো সম্পূর্ণ মুক্ত নই। চোখ-জ্বলানো আগুনের রাশি অতি নিকটে

এসে ক্রূর হাসি হাসছে। গ্রাস করতে সে প্রস্তুত। সুবিশাল বিমানের অর্ধেকের বেশী সে আত্মসাৎ করেছে। মানুষের জীবন তার কাছে অতি তুচ্ছ। মানুষ বা ধাতু যা তার মুখের কাছে পড়ছে সবই সে গ্রাস করে চলেছে, আর যে মানুষ নিজেকে বিশ্বভুবনের কর্তা মনে করে তার অসহায়তা দেখে বিকট মুখবিকারে হেসে চলেছে। বহু বিমান বিধ্বংসের কাহিনী সম্ভবত এরই অনুরূপ। পরাহত মানুষ এর বিপদের মুখ থেকে প্রাণ রক্ষা পায় অন্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার জন্যে।

চারিপাশে দৃষ্টি ফিরিয়ে বুঝতে পারলাম ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ আমায় ঘিরে রয়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। নিকটতম দ্বীপটি মাইল চারেক দূরে। দক্ষিণের একটি ছোট দ্বীপে বেশ উঁচু একটি পাহাড়। সে যেন হাতছানি দিল আমাকে। পাহাড়টি ওই দ্বীপকে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় করে তুলেছিল। নিকটতর দ্বীপগুলির আহ্বান উপেক্ষা করে বোধকরি সেই কারণে আমি ওর দিকে এগিয়ে চললাম। স্পষ্টতই অহেতুক এই নির্বাচনের কারণ আমার জানা ছিল না। ওই দূর দ্বীপ পর্যন্ত যাবার শক্তি সামর্থ্য আমার নেই তাও আমি জানতাম। তবু এক অদ্ভুত আকর্ষণ আমার সাধারণ বুদ্ধিকে বিমুগ্ধ, আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেই ঘটনা যখনি স্মরণে আসে তখনি আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে ওর দিকে সাঁতার দিয়ে যাবার আমি চেষ্টা করি নি। এখন আমি জানি যে, নিকটের দ্বীপগুলোর যাওয়ার চেয়ে দূরের ওই দ্বীপটিতে যাবার চেষ্টা করাই সহজ হত, কারণ সে দিকেই স্রোত বইছিল। কিন্তু তার অর্থ হত আগুনে জ্বলে নিশ্চিত প্রাণ হারানো। জ্বলন্ত তেল আর পেট্রল স্রোতের মুখে সেদিকেই বয়ে যাচ্ছিল। আমি সে দিকে যাবার চেষ্টা করলে জ্বলন্ত তেল আমাকে গ্রাস করত।

যে দ্বীপটিতে যাব স্থির করেছিলাম তারই কথা চিন্তা করতে করতে আমি প্রকৃত পক্ষে কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে জলে ভেসে রইলাম। আমার সামনে দিয়ে ফিউজীলেজ্ (পাইলটের আসন আর কণ্ট্রোল, ইত্যাদির

কাঠামো)—প্রায় ফুট দশেক লম্বা একটি অংশকে ভেসে যেতে দেখলাম। দ্বীপের দিকে যাবার শক্তি সঞ্চয় করে নিতে ভাসমান ওই অংশটিকে অবলম্বন করার এক ঝোঁক আমায় পেয়ে বসল। তৎক্ষণাৎ দ্বীপের পানে যাবার প্রসঙ্গ ভুলে আমি দ্রুত সাঁতার কেটে ভাসমান ফিউজীলেজ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলাম। শার্ট আর ট্রাউজার পরেই সাঁতার কাটতে হচ্ছিল। জলে ভিজে ওগুলো তখন ভারী হয়ে গেছে। সম্ভবত 'শক্'-এর দরুন ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। ফিউজীলেজের ওই অংশটিকে আমি আঁকড়ে ধরলাম। তার পাশগুলো ছিঁড়ে দুমড়ে ধারালো হয়েছিল। হাত দুটোকে বাঁচাবার জন্যে জায়গা আমাকে খুঁজে নিতে হল ভাসমান ওই খণ্ডে উঠে পড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেরে উঠলাম না। শক্ত কিছু ছিল না যার ওপর পা রেখে ওঠা যায়। ভিজে জামাকাপড় আমায় জলেই টেনে রাখছিল। কিন্তু টুকরোটাতে উঠতে আমাকে হবেই। ভাসমান এই অবলম্বনকে ত্যাগ করতে আমি রাজী ছিলাম না। সম্ভবত সাহায্য এসে না পৌছনো পর্যন্ত এর সাহায্যে আমি ভেসে থাকতে পারি। না,—এই নিয়ে অপেক্ষা করা আত্মহত্যার সামিল। বিশেষত যখন মাটি দৃষ্টিগোচর আর সূর্য তখন প্রখর তেজে দীপ্ত। সাঁতার দিয়ে পার হবার মত শরীরে শক্তি না ফেরা পর্যন্ত এর ওপরেই বিশ্রাম নেব স্থির করলাম। ঝাঁকানি দিয়ে জল থেকে শরীরটা উঁচু করে ডান হাঁটুটা এর ওপরে রাখতে পারলাম। তারপর বাঁ পাখানাও জল থেকে তুলে নিলাম। তারপর উঁচু হয়ে আমি এই টুকরোটার ওপরে দাঁড়ালাম। ভাঙাচোরার মধ্যে অনেক ধারালো কোণ উঁচু হয়ে আছে। বিমানে ঘুমোবার আগে আমি আমার জুতো জোড়া খুলে রেখেছিলাম, আর বিমানখানির সঙ্গে জলে পড়ার সময়ে সম্ভবত মোজাদুটো খুলে গিয়ে থাকবে। পায়ের আঘাত বাঁচাবার চেষ্টা করতে হল।

বিশাল অগ্নিকুণ্ডের থেকে কুড়ি ফুট দূরে তখন আমি দাঁড়িয়ে। ভয়াবহ দৃশ্যেরও এক আকর্ষণ থাকে। আমি অনেক সময় ভেবেছি,

অমন ভয়ঙ্কর আগুনের অত কাছে কেন আমি অপেক্ষা করে রইলাম। ছড়িয়ে পড়ে ও আমার জ্বালিয়ে দিতে পারত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঁতরে দূরে সরে যাওয়াই সম্ভবত সবচেয়ে নিরাপদ হত। কিন্তু ওই অগ্নিকায় দৈত্যের রূপে আমি তখন আত্মহারা হয়ে শুধু নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মাথার ওপরে আকাশ তখন ঘন কালো, ধোঁয়ার কুণ্ডলী মেঘের মতো আকাশ ব্যাপ্ত করেছে। এই বিপুল তমসার নিচে লক্ষ উন্মত্ত উলঙ্গ শিখা, ক্ষুধিত সহস্র ড্রাগনের মতো এক সমাবেশে জমায়েত হয়েছে। তাদের রক্তিম আভায় সমুদ্র রঞ্জিত। প্রজ্বলন্ত তেল, পেট্রল আর বিমানের ভগ্নাবশেষ প্রতি তরঙ্গশীর্ষে নির্মমতা প্রতিফলিত করছে। ঘন নীল গ্রীষ্মমাণ্ডলিক সাগর কয়েক মুহূর্তে এক দীপ্তবহ্নির সাগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। পাখার খাঁচায় বদ্ধ পেট্রলের সমস্ত তেজ যা ইঞ্জিনে নিয়ন্ত্রণাধীনে জ্বলত, সহসা জাদু-করের পাত্র থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল, আর, যে মানুষ সচরাচর তাকে চালনা করে থাকে, বিভীষিকা হয়ে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল।

ভাসমান কেবিনের ওই অংশে উঠে পড়ার কয়েক সেকেণ্ড পরে জলের ওপর আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল (পেট্রল জলে ছড়ানোর দরুন)। এক ধরনের অসহায় ভাব আমাকে গ্রাস করেছিল। অগ্রসরমাণ জ্বলন্ত মৃত্যুর বাহুবিস্তার এড়িয়ে যাবার জন্যে আবার জলে লাফিয়ে পড়তে আমার পা দুটো অস্বীকার করল। আমার মনে হল এই ক্রমবর্ধমান আগুনের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করা নিরর্থক। চলে যাবার প্রয়াস মাত্র না করে আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম, যন্ত্রণার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে। বেশীর ভাগ বিমান ধ্বংসের পরিণাম বোধ করি এমনই হয়। প্রথম আঘাতে যারা প্রাণরক্ষা পায়, উপর্যুপরি অন্য আঘাত তাদের অনুসরণ করে ধেয়ে আসে—বিজেতার সৈন্য যেমন নিশ্চিহ্ন করতে চায় পরাভূত সৈন্যদলের ছত্রভঙ্গ অবশেষকে। আগুন ক্রমে নিকটবর্তী হয়। তাদের ভীষণ নির্মম রক্তপিপাসা দেখে শিকার

অনুসরণকারী নরখাদকদের কথা আমার মনে হল। অসহায় ভাবে আমি শিখার সেই নৃত্য দেখতে লাগলাম। প্রচণ্ড উত্তাপ অতি সন্নিকটে বোধ হল। আগুনের আভা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল, তাই আমি চোখ বুজলাম। অনুভব করলাম, কয়েক মুহূর্তে সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হবে। জলের মধ্যে আর যুঝতে হবে না, প্রবাল পাহাড়ে ঘুরে মরতে হবে না, নির্জন দ্বীপে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রাণ হারাতে হবে না। যন্ত্রণাদায়ক অন্য মৃত্যু ভোগ করার চেয়ে এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো। পর মুহূর্তে আসবে শিখার আলিঙ্গন। সেই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলাম, সবিস্ময়ে বোধ করলাম উত্তাপ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। চোখ খুলে দেখলাম। আগুন সামান্যও প্রশমিত হয় নি, কিন্তু তা আর আমার দিকে এগিয়ে আসছিল না। আমি আশ্বস্ত বোধ করলাম। আগুন সম্ভবত পাতলা পেট্রলের স্তরের জন্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন তা জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। আগুনে জ্বলে মৃত্যুর ভয় থেকে নিস্তার পেয়ে আমি আবার নতুন করে কোন্ দ্বীপ নিকটতম হবে, এই বিচারে মন দিলাম। ভাসমান ধাতুখণ্ডটির ওপরে থাকা লোভনীয় হলেও, বেশীক্ষণের জন্যে একে ভরসা চলে না। পরিশেষে এ ডুবতে পারে। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। অনেকগুলি ছোট দ্বীপ আমাকে ঘিরে।

ফিউজীলেজে আশ্রয় নেবার পর বড়োজোর আধ মিনিট হয়ে থাকবে, আমি পাঠককে ভেসে উঠতে দেখলাম। কেমন একটু দিশেহারা হয়ে তিনি আগুনের ভীষণ কাছে একই জায়গায় ক্রমাগত সাঁতার কেটে ঘুরছেন আর চিৎকার করছেন। জল থেকে মাথা তুলে আগুনের প্রবাহকে এত কাছে দেখে তিনি সহসা আর সভয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। উত্তাপ নিদারুণ অসহ্য বোধ হয়েছিল নিশ্চয়ই। শুনতে পাবার ক্ষমতা তাই লোপ পেয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, পাঠকের তেমনি দশাই হয়েছে। দুরন্ত আগুনের কত কাছে তখন তিনি, তা বুঝতে পারছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে তিনি

একই জায়গায় ঘুরছিলেন। আমি চিৎকার করে বললাম, 'পাঠক, আগুনের থেকে সরে যাও, পাঠক, আগুনের থেকে সরে যাও…'

আমার চিৎকার তাঁর স্নায়ুকে ভয়ংকর বাস্তব সম্পর্কে সচেতন করে দিল; বিমান ধ্বংস হয়ে সাগরে ডুবেছে। অন্য কর্মী আর যাত্রীদের কীহয়েছে তিনি জানতেন না। তিনি শুধু বুঝতে পারছিলেন যে আমি তাঁকে ওই ভীষণ আগুনের স্রোতের কাছ থেকে সরে যাবার জন্যে চিৎকার করছি।

পাঠক তাই শুনে সাঁতরে চলে এলেন; আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁর ওপাশে আমি দীক্ষিতকে দেখতে পেলাম। তিনি সবে মাত্র ভেসে উঠলেন। অনেকক্ষণ জলের নিচে থাকতে হয়েছিল ওঁকে। এখন আমি তাঁকে ডাকতে শুরু করলাম। "চলে এসো ক্যাপটেন, আগুনের কাছ থেকে সরে এসো, আমার কাছে এসো; আমি একা থাকতে পারছি না, সরে এসো ক্যাপ্টেন।" আমি এখনো জানি না তাঁকে ক্যাপটেন বলে কেন ডাকছিলাম। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দীক্ষিত …এমন কি ডিকিই তাঁকে সাধারণত বলে থাকি। বোধ হয় মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালে সাধারণ বিচার-বুদ্ধি থাকে না। জলের মধ্যে থেকেই তিনি আমায় ধমক দিলেন, "ক্যাপটেন ভুলে যাও।" হ্যাঁ, এখনকার মতো আমাদের সম্মান আর পদমর্যাদার কথা ভুলে থাকতে হবে। বিমানখানা ভস্মীভূত আর ধ্বংস হয়ে অতলে তলিয়েছে। পরিচালনা করার জন্যে কোনো বিমান এখন নেই তাঁর। একই বিপদ আমাদের সবাইকে একই স্তরে এনে ফেলেছে।

দীক্ষিত ডাক শুনে আমাদের দিকে ভেসে এলেন। পাঠক ইতিমধ্যে আমাকে পার হয়ে গেছেন। জলে ঝাঁপ দিয়ে দীক্ষিতের সঙ্গী হবার ইচ্ছে হল। ঠিক সেই সময়ে যে ভাসমান খণ্ডটি অবলম্বন করে আমি এতক্ষণ ভেসে ছিলাম সেটি অতি দ্রুত তলিয়ে যেতে শুরু করল। পাথর মনে করে তাতে হেলান দিতে গেলে যদি সেটি

বিশ্বাসঘাতক হয়ে হঠাৎ কুমিরের চেহারা ধরে তাহলে যেমন হয়, আমার অবলম্বনটিরও সেই দশা। আমিও ডুবে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তাই সব নয়। ফিউজীলেজের কোনো ভাঙা কোণে আমার ট্রাউজার বেধে গেছে, আর আমাকে সে জলের নিচে টেনে নিয়ে চলেছে।

হায়, এতোদূর এসে অবশেষে জলে ডুবে প্রাণ হারাতে হবে। কী মর্মান্তিক অবস্থা। ছিন্নভিন্ন জ্বলন্ত বিমানের থেকে জীবিত বার হয়ে আসার পর, ঘননীল জলে টেনে নিয়ে আমায় ডুবিয়ে দেবে। প্রাণদায়ী বাতাস আর বুকে নেব না। নিচে আমায় টেনে নিয়ে যাবে আর ফুস্‌ফুসে অক্‌সিজেনের স্থান নেবে লোনা-জল। ফুস্‌ফুস বৃথাই প্রাণপণ করবে, অবশেষে সব প্রচেষ্টার অবসান হবে অবশ্যম্ভাবী এক যবনিকা পতনে। এত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু নিয়তি কেন আমার জন্যে স্থির করে রেখেছে? বিমান ছিন্নভিন্ন হবার সময় আমার মৃত্যু হল না কেন? আমি পরিণামের জন্যে প্রস্তুত হলাম। পলকমাত্রে বেদনাহীন মৃত্যুও আমার হতে পারত, কিন্তু তা নির্বাচন করে নেবার কর্তৃত্ব আমার নেই। যা কিছু আসুক আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। না—আমি ভাবলাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যতক্ষণ যুঝবার শক্তি আছে, সংগ্রাম আমায় করে যেতেই হবে। মৃত্যুর ভ্রূকুটি দেখে নিরস্ত হলে চলবে না। অতি সহজে ছিঁড়ে পড়তে পারে এমনই এক ক্ষীণ সুতোয় হয়তো জীবন রক্ষিত রয়েছে। তবু মৃত্যুকে অস্বীকার করে এই ক্ষীণ প্রাণ-তন্ত্রকে হয়তো দৃঢ়তর করা যায়। 'ডান পায়ের ট্রাউজারটা বেধে গিয়ে-ছিল। আমার সমস্ত শক্তি সংহত করে সেই পায়ে বিশ্রী জখম হতে পারে, একবারও তা মনে হয় নি। বিক্ষত পায়ের মূল্য দেবার যোগ্য বৈ কি, জীবনটা। ওই ধাক্কায় কাজ হল। হাঁটু পর্যন্ত জলে যখন আমায় সে টেনে নিয়ে গেছে তখন আমি ফিউজীলেজের থেকে মুক্ত হলাম, আর সে দক্ষিণ চীন সাগরের অতলে বালুশয্যায় তার আবাস সন্ধানই শ্রেয় মনে করল।

নির্মম মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ কী আনন্দের অনুভব!

জীবিত থাকার সম্ভাবনা আছে, এ ধারণা আবার ফিরে পাওয়া! মৃত্যু চির বিদায় নেয় নি। এর মৃদু পদশব্দ বাতাসে ভাসছে। কিন্তু প্রাণ-আবার আমার মধ্যে সমারোহে জেগে উঠেছে। জীবনের জন্য সংগ্রাম শিথিল হলে চলবে না। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এলে তবেই প্রাণ-ধারণের আনন্দ স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা যায়। ক্ষণস্থায়ী হলেও, 'বেঁচে আছি'—এই সুখস্বাদ অপূর্ব।

দীক্ষিতের কাছে সাঁতরে গেলাম। তাঁর স্ফীত হলদে রঙের লাইফ-জ্যাকেট চোখে পড়ল। এতক্ষণে সচেতন হলাম যে সারা সময় আমি সাঁতার কেটে চলেছি। অজান্তেই চিৎকার করে উঠি, 'আমার জ্যাকেট কোথায়?' হ্যাঁ, জ্যাকেট আমার জড়ানোই আছে। নজরে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট কাছেই। স্ফীত করার স্বয়ংক্রিয় লিভারটি ধরে টান দিলাম। জ্যাকেটটি নড়ে উঠল আর আমাকে সাঁতার কাটার অবস্থা থেকে আরো ইঞ্চিখানেক উঁচুতে তুলে দিল। অনায়াসে ভেসে থাকতে পারায় আমি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলাম। আবার একবার নিকটতম দ্বীপটির সন্ধানে তাকালাম। তখন দীক্ষিত আমায় বললেন, "কারনিক, আমার একটা কলার বোন্ ভেঙে গেছে, আমাকে একা ছেড়ে যেও না।"

আমি দ্বিধামাত্র না করে উত্তর করি, "চিন্তা কোরো না, ডিকি, আমি তোমার সঙ্গেই আছি। আমরা একসঙ্গেই সাঁতার কাটব কিংবা একসঙ্গেই ডুবব।"

নির্বাচনের দায়িত্ব এবারেও আমাদের ছিল না। কোথা থেকে তপ্ত এক জলের প্রবাহ এল (পরে বুঝেছি, জলের ওপরে পেট্রল জ্বালার জন্যেই ওই স্রোতের জন্ম হয়েছিল), আমরা তিনজনেই ওই স্রোতের মুখে পড়লাম। আগুনের রাশির থেকে দূরে টেনে নিয়ে চলল সেই স্রোত। প্রথমে পাঠক, তারপর আমি, আর আমার পর দীক্ষিত পরস্পর থেকে প্রায় পনেরো ফিট দূরে দূরে। স্রোতের এমন টান যে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আগুনে জ্বলে মৃত্যুর আশঙ্কার সীমা ছাড়িয়ে ক্রমশ দূরে, আরো দূরে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল। আশ্চর্য, আরো একজন আবার ভেসে উঠেছে। তার আর্তস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলাম। যন্ত্রণাকাতর সেই চিৎকার। আর্তনাদ ছাড়াতে ইংরিজিতে সে চিৎকার করে বলল, "কোথায় তোমরা? কোথায়?" ডাক শুনেও তার কাছে এগিয়ে যাবার আমাদের উপায় ছিল না কারণ আমরা ভেসে সরে যাচ্ছি। দীক্ষিতের থেকে সে প্রায় কুড়ি গজ দূরে। আমরা তিনজনে পরস্পারের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। একসঙ্গে তিনজনেই বলে উঠলাম, "নিশ্চয় ডি-কুনহা, সম্ভবত সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে।" আমরা হাত তুলে চিৎকার করলাম, "আমাদের অনুসরণ করো।"

বলা প্রায় নিরর্থক ছিল। তিনিও একই স্রোতে আমাদের দিকে ভেসে আসছিলেন, সম্ভবত বিনা চেষ্টায়। পরস্পর কথাবার্তা কইতে কইতে আরো একজনকে ভেসে উঠতে দেখলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি, আর বুঝতে পারার উপায় ছিল না যে ওই লোকটি সজ্ঞানে আছে বা জ্ঞান হারিয়েছে, জীবিত আছে কিংবা নেই। একটি হলুদ রঙের ফাঁপিয়ে-তোলা লাইফ-জ্যাকেট মাত্র দেখতে

পাচ্ছিলাম। জীবিত আর সচেতন না থাকলে লাইফ-জ্যাকেট ফাঁপিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, অতএব আমরা ধারণা করলাম যে ওই লোকটি জীবিত আছে।

আমরা পাঁচজনে, প্রথম তিনজনে প্রায় একসঙ্গে আর বাকী দুজনে বিশ-ত্রিশ গজ তফাতে জ্বলন্ত তেল আর পেট্রল থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছিলাম। আগুনের থেকে সরে যাচ্ছি দেখে আমরা সুখী হলাম। বিস্তারিত অগ্নিকুণ্ড আর আমাদের গ্রাস করতে পারবে না। অগ্নিদানব নিজেই তার কবল থেকে সরে যেতে আমাদের সাহায্য করল।

প্রায় একশো গজ যাবার পর স্রোত থেমে গেল আর সকলের গতি স্তব্ধ হল। আরো কেউ জলের ওপরে আর প্রাণের প্রবাহে ভেসে উঠুক এই আশা করছিলাম আমি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাত্র আমরা পাঁচজনেই যা কিছু করুণার দর্শন পেয়েছি। এতক্ষণে আগুন অনেক হ্রাস পেয়েছে আর পশ্চিমের পানে সরে চলে যাচ্ছে। এও ভাগ্যের কথা। আমরা ভেসে চলেছিলাম দক্ষিণে।

এই প্রথম আমরা ভীতিকর আগুনের থেকে সম্পূর্ণভাবে সাবধান দূরত্বে পৌঁছেছি। নিরাপত্তার খোঁজে এবার অনেক স্পষ্ট নির্দিষ্ট নির্ভুল দিগ্‌দর্শনের অবকাশ পাওয়া গেল। এতক্ষণ অপমৃত্যুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে যা কিছু হাতের কাছে পেয়েছি, যা কিছু চোখে পড়েছে তাকেই অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছি। পাঁচটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ ভেসে নেই। শেষের দুজনের পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। ওরা দুজনে জলে ডুবে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে ভেসে উঠেছে। এতক্ষণ দম বন্ধ করে থাকতে পারায় তাদের মনোবলকে আমি মনে মনে প্রশংসা করি। এরা দুজনে একের পর আর-একজন ভেসে উঠেছে। ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে আরো কারো ভেসে ওঠার প্রতীক্ষা করছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, অন্য সকলেই সম্ভবত ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন প্রায় সর্বই শান্ত হয়ে এসেছে। সেই উষ্ণ প্রবাহ স্তব্ধ হয়েছে, আগুন

ক্রমশ নিভে আসছে, সলিল-সমাধিতে অন্য চোদ্দ জন এতক্ষণে সম্ভবত শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ করেছে। আর একবুক শ্বাস নেবার জন্যে তারা আর কখনো যুঝবে না, বাধা দেবে না, ক্ষুধিত হাঙরের প্রখর দশন যখন তাদের দেহে বিদ্ধ হতে চাইবে।

আমাদের সবদিক দ্বীপে ঘেরা; একটি বড়ো আর তিনটি অপেক্ষাকৃত ছোট। বিমান ধ্বংস হওয়ার জায়গা থেকে উষ্ণ জলের প্রবাহ আমাদের 'এ' দ্বীপের পানে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই দ্বীপে যাওয়াই আমি স্থির করলাম। প্রথমত স্রোত আমাদের এদিকেই এগিয়ে দিয়ে গেছে, তাই আশা করলাম যে সে পথে গেলে বাধা কম পাবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত সালোর বা গ্রেট নাতুনা দ্বীপের চেয়ে 'এ' দ্বীপকে বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করি কারণ তার নারকেলগাছে ভরা সমতল ভূ-ভাগ: অপরপক্ষে সালোরের পাহাড়ে ভরা ঊষর ভূ-ভাগ আর গ্রেট নাতুনার অস্পষ্ট ঝোপঝাপে ভরা অনিশ্চয়তা। কোনো কারণ নির্দেশ না করেই দীক্ষিতকে চেঁচিয়ে বললাম, "চলো ওই দ্বীপটির দিকে যাওয়া যাক।" 'এ' দ্বীপের পানে দেখালাম আর পাঠককেও একই সংকল্প জানালাম।

দ্বিতীয় দফা প্রাণ রক্ষার প্রয়াস তখন শুরু হল। পাঠক, আমি আর দীক্ষিত প্রায় একসঙ্গেই ছিলাম আর অন্য দুজনে প্রায় পঞ্চাশ গজ পেছনে। পাঠকের বাঁ হাতের দুটি হাড়ই ভেঙে গিয়েছিল, ডান দিকের 'কলার-বোন' ভাঙা ছিল দীক্ষিতের। আমি জানতাম আমার শরীরের কোনো হাড় ভাঙে নি। তবু জল সরাবার সময় ডান পায়ের পাতায় যন্ত্রণা বোধ করছিলাম আর বাঁ হাতটা যেন নাড়তে পারছিলাম না। অন্য কোনো আঘাতের গুরুত্ব নিরূপণ করা তখন সম্ভব হয় নি। অপর দুজনের সম্পর্কে তখন আমরা কিছুই জানি না।

আমাদের মনে হল, প্রকৃষ্টতম উপায় হল যথাসত্বর সম্ভব নিকটতম দ্বীপে পৌঁছানো আর যে প্রথম পৌঁছবে তার কাজ হবে স্থানীয় অধিবাসীদের সংগ্রহ করে অন্যদের সাহায্যার্থে আসা। সকলে

একসঙ্গে যেতে গেলে অমূল্য দিবালোকের অপব্যয় হবে, আমরা ভাবলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, দ্বীপগুলিতে কোনো বাসিন্দা থাকার সম্ভাবনা অতি অল্প, এমনি তাদের ঊষর চেহারা। এ কথা মনে করার আরো মুখ্য কারণ এই যে এত বিশাল একখানি জ্বলন্ত বিমানের সমুদ্রে এসে পড়া সমীপবর্তী দ্বীপগুলি থেকে নজরে পড়ার কথা, আর বিমান ধ্বংসের পর যে আগুন আর ধোঁয়া জলে ছড়িয়ে উঠেছিল সে নিশ্চয়ই বেশ কয়েক মাইল দূর থেকেও দেখা গেছে। এত বড়ো একটা দুর্ঘটনার দৃশ্য সরল গ্রামবাসীদের নিশ্চয়ই তাদের কুটির থেকে আকর্ষণ করে আনত। অপরপক্ষে দীক্ষিত অত্যন্ত আশা পোষণ করছিলেন। অমন বিরস চেহারা সত্ত্বেও ওই দ্বীপে সাহায্যের সম্ভাবনা তিনি প্রত্যাশা করলেন।

মনে হচ্ছিল অল্পায়াসেই দ্বীপটিতে পৌঁছনো যাবে। সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছে যাবার জন্যে যথাসাধ্য করতে হবে। ভাঙা হাড় থাকা সত্ত্বেও পাঠক আর দীক্ষিত প্রশংসনীয় ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রয়োজন হলে যাতে সাহায্য করতে পারি, এই ভেবে আমি দীক্ষিতের কাছাকাছিই রইলাম। তিনজনেই প্রাণপণ চেষ্টা করে চলি। আধ ঘণ্টায় বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। শেষের দুজন পেছনে বহু দূরে ভাসছেন তখন।

উজ্জ্বল সূর্য তখন ক্রমে আরক্তিম মুখে পশ্চিম দিগন্তের পানে দ্রুত চলেছে। তার আভা পশ্চিমের জলরাশিতে আর বিশাল নির্মেঘ আকাশে রঙের আভাস দিয়েছে। পেছনে বহুদূরে কাশ্মীর প্রিন্সেসের ভগ্নাবশেষ সরু একফালি আকারহীন কালো মেঘের মতো ধীর গতিতে পশ্চিমের দিকে সরে যাচ্ছে। সবুজ উঁচুনিচু ছোট দ্বীপগুলি তির্যক সূর্যকিরণে উজ্জ্বলতর দেখাল—তারাই আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা এখন।

পুরো এক ঘণ্টার পরিশ্রম প্রায় নিষ্ফল হল। ছোট 'এ' দ্বীপ, যার পানে আমরা চলেছিলাম, তার দূরত্ব প্রথমে যা ছিল তার চেয়ে আর

যেন কমেনি। তা ছাড়া ওই ছোট দ্বীপের পানে যাওয়াও দীক্ষিত বিপদের আশঙ্কা বোধ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে জলের স্রোত যদি আমাদের দ্বীপের পাশ থেকে সরিয়ে দেয়, আমরা নিশ্চয়ই 'এ' দ্বীপ আর নাতুনা দ্বীপের মাঝের ফাঁক দিয়ে, বা 'এ' দ্বীপ আর সালোর দ্বীপের মাঝ দিয়ে গভীরতর সমুদ্রে গিয়ে পড়ব আর হাঙরেরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করবে। তিনি দিক বদলের প্রস্তাব করলেন, আর আমরা দুজনে তাঁকে অনুসরণ করলাম। গ্রেট নাতুনার আমাদের দিকে প্রায় দুমাইল বিস্তৃত তটদেশ। সেখানকার স্রোত আমাদের তীরের শেষ পর্যন্ত ভাসিয়ে দেবার মতো প্রখর হতে পারে না।

আয়ুস্বরূপ রক্তরাঙা সূর্য তখন দিগন্তশায়ী, সাগর-গাহনে উন্মুখ। সন্নিকটে সেই একমাত্র বন্ধু। সে কারো জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। অপরের ভাগ্য-নিরপেক্ষ তার দিনপঞ্জী-পরিক্রমা। হয়তো আর কখনো তার দেখা পাব না আমরা। ১৯৫৫ সালের এগারোই এপ্রিলের সূর্যাস্ত আমাদের জীবন-সূর্যেরও অস্তাচল-গমন হতে পারে।

পাঠক আমাদের প্রায় একশো গজ আগে। দীক্ষিত আর আমি গ্রেট নাতুনায় পৌঁছবার চেষ্টায় রত রইলাম। হুইসিল (যা লাইফ-জ্যাকেটের সঙ্গেই থাকে)-এর সাহায্যে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ রইল। দীক্ষিতের লাইফ জ্যাকেটে তখন থেকে একটি ওয়াটার-প্রুফ ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বলছিল। এতক্ষণ তা চোখে পড়ে নি। সূর্যের আলো ম্লান হয়ে আসতেই ছোট বালবটি দেখা যেতে লাগল। এর উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছিল আর সে উপস্থিতি সুখদায়ক। এই ক্ষুদ্র আলোই আমাদের ত্রাণকর্তা হতে পারে, নিমজ্জমানের কাছে তৃণ-খণ্ডের মতো, ভূলোকের এই অংশে ক্ষণপরে যে ভয়াবহ অন্ধকার নেমে আসবে তার মধ্যে এই স্বল্প আলোকবিন্দু আমাদের সহায় হবে। পেছনে যে দুজন আসছিল তারা এত দূরে রয়ে গিয়েছিল যে অসংখ্য ছোট ছোট ঢেউয়ের আড়ালে তারা হারিয়ে গিয়েছে।

শার্টের বাঁদিকের হাতা সরিয়ে সময় দেখতে গেলাম। বিস্মিত হলাম যে ঘড়িটি কখন মণিবন্ধ থেকে খসে গেছে। তার জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বোধ করলাম না। আমি জানতাম যে মাটি স্পর্শ করা বা শ্রান্তিতে মরার আগে পর্যন্ত যুঝতেই হবে। সময় জানতে পারলে, কতক্ষণ ধরে সংগ্রাম করছি এই সংবাদ হয়তো নিরুৎসাহ করার কারণ হত।

পাশের দ্বীপে অবিলম্বে যাবার চেষ্টাই আমাদের সারা মন অধিকার করে আছে। প্রথমে ধারণা করেছিলাম যে একঘণ্টার আগেই আমরা ওই দ্বীপে পৌঁছব। সে চেষ্টা শুরু করার পর এতক্ষণে এক ঘণ্টার অনেক বেশী সময় কেটে গেছে আর আমরা বুঝতে পারলাম যে সম্ভবত মাটিতে পা রাখতে এখনো তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগবে।

দীক্ষিত আর আমি যদিও পাশাপাশি ভেসে আর সাঁতার কেটে চলেছি এক ঘণ্টা যাবৎ, আমরা জানতাম না অপরজনে কেমন করে বিমানের বাইরে আসতে পেরেছে -যে জ্বলন্ত বিমানে জলের মধ্যে ধ্বংস হয়ে ডুবলে একলক্ষের মধ্যে একজনের সম্ভাবনা থাকে তার থেকে জীবিত নিস্তার পাওয়া। দীক্ষিত আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি এমারজেন্সি জানলা বেয়ে বেরিয়েছ ?" "না", আমি জানালাম, "আমার মনে হয় বিমানখানা ভেঙে টুকরো হয়ে যেতে আমি জলে গিয়ে পড়লাম।"

"তুমি কি করে কক্‌পিট থেকে বোরিয়ে আসতে পারলে ?" আমি প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, "আমার সামনের জানলাটা দিয়ে।"

"সত্যি ? এ ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার। বিমানপোতে থাকার সময় কতগুলি পরীক্ষা আমরা ঐ জানলা দিয়ে করে থাকি, কিন্তু তাও কোমর পর্যন্ত বার করে। আর ভগবান, সে যে কী কষ্টের ব্যাপার। আমার মনে হয় না জলের মধ্যে থেকে ঐ জানলা বেয়ে আমি কখনো বেরিয়ে আসতে পারতাম।"

তারপর তিনি বিস্তারিত বিবরণ দিলেন।

ডানদিকের পাখার কোনা জলে ছুঁতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, পর মুহূর্তে বিমানটি জলে আছড়ে পড়বে। জল অতি দ্রুত

নিকটবর্তী হচ্ছিল। ক্রমশ কাছে, আরো কাছে এসে পড়ল। জলের ঝাপটা মুখের ওপরে অনুভব করতে পারলেন তিনি। জলের অত্যধিক চাপের দরুন তাঁকে চোখ বন্ধ করে নিতে হল। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর চারিধারে জল আর জলের বেগ এত বেশী যে আসনে তাঁকে চেপে রেখে দিল। এটাই সৌভাগ্য বলতে হবে, কারণ তা না হলে জলের সঙ্গে বিমানের ঘা খাওয়ার ঝাঁকুনিতে কনট্রোল কলস্এ তাঁর মুখ কিংবা উইণ্ড-শিল্ডএ তাঁর মাথা ভীষণভাবে ঠুকে যেত।

ক্রমে জলের বেগ কমে এল আর বিমানখানি স্তব্ধ হল। কানের পর্দায় নিদারুণ চাপ লাগছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে বিমানখানি ডুবে গেছে আর তিনি তারই অঙ্কে সমুদ্রের নিচে পড়ে আছেন। চোখ খুললেন। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্বাস শেষ হবার আগে এর মধ্যে থেকে ত্বরিতে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে এটুকু তিনি জানতেন।

নিজের স্ট্র্যাপ খুলে তিনি ঝড়ের সময়ে ব্যবহারের জানলাটির ফাঁক হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন। তিনি জানতেন বিপদের থেকে মুক্তি পাবার ক্ষীণ যে-সব সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে জানলার ওই অবকাশটুকুই সবচেয়ে আশাপ্রদ। ন্যাভিগেটরের ঘরের এমারজেন্সি এক্সিট বা কর্মীদের যাতায়াতের পথ সবগুলোই ফুস্ফুসে বাকি অক্সিজেন-এর পক্ষে অনেক দূর। জানলাটিকে তিনি সম্পূর্ণ খুলে দিলেন, ককপিটের কোথায় একটা পায়ের ভর দিলেন আর জানলা দিয়ে শরীরটা বাইরের দিকে ঠেলে তুলে দিলেন। বিপদ কেটে গেছে --তিনি ভেবেছিলেন।

শরীরের আধখানা সহজেই বাইরে চলে আসার পর অপ্রত্যাশিত এক দুর্যোগের সম্মুখীন হলেন। দেখতে পেলেন, তাঁর কোমরটা জানলায় বেধে গেছে। যার ওপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তারই সাহায্য নেবার চেষ্টা করলেন। তাও তাঁকে কক্পিট থেকে মুক্ত করতে পারল না। সেই কক্পিট, যেখানে বসে তিনি জাতারকে সাহায্য করেছেন বিমান নিয়ন্ত্রণে, সেই কক্পিট ওঁকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। তবু মুক্তি তাঁকে পেতেই হবে। কিন্তু কেমন ভাবে ?

শেষ সম্ভাবনার আশায় তাঁকে ঝুঁকি নিতে হবে। লাইফ-জ্যাকেটটিকে ফুলিয়ে নেবেন তিনি। প্রতিবার আকাশে ওঠবার সময় লাইফ-জ্যাকেট ড্রিলে তিনি শুনেছেন, "সম্পূর্ণরূপে বিমানের বাইরে এসে না পড়া পর্যন্ত লাইফ-জ্যাকেট ফাঁপিয়ে নেবেন না। বিমানের ভাঙা ধাতুর খোঁচায় লাইফ-জ্যাকেট ছিঁড়ে যেতে পারে।" এই তার শেষ সুযোগ। এর থেকে একেবারে মুক্তি না পাওয়ার চেয়ে লাইফ-জ্যাকেট ছিঁড়ে গিয়ে মুক্তি পাওয়া তবু ভালো। লাইফ-জ্যাকেটের টগল্ ধরে তিনি ঝাঁকানি দিলেন। সহসা ডান কাঁধের কাছে নিদারুণ যন্ত্রণা বোধ করলেন, আর বুঝতে পারলেন যে ওপরের দিকে তিনি ভেসে উঠছেন জলের স্তর ভেদ করে। অবশেষে তিনি নিরাপদে জলের ওপরে ভেসে উঠলেন। তখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে ডানদিকের কলার বোন ভেঙে গেছে। কেমন করে বা কখন ভেঙেছে নিজেই জানেন না। দীক্ষিত আর আমি পাশাপাশি ভাসতে ভাসতে কথা কইতে থাকলাম। আমরা দুজনেই আশা করেছিলাম হয় পাঠক দ্বীপে পৌঁছে গেছেন কিংবা অনতিবিলম্বে পৌঁছবেন। দীক্ষিত বার বার বলতে লাগলেন, 'আশাকরি পণ্ডিতজী (বন্ধুমহলে পাঠকের প্রচলিত নাম) জেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আর নৌকা নিয়ে আমাদের সাহায্যে আসছে।' দ্বীপে কোনো অধিবাসী থাকতে পারে এ বিশ্বাস আমার ছিল না, আমাদের মনে সাহস জাগিয়ে রাখার জন্যে মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। আর ইচ্ছে করেই বললাম, "আমারও সেই আশা।"

আমি আমার বাঁ হাত আর দীক্ষিত নিজের ডান হাত সাঁতারের জন্যে ব্যবহার করতে পারছিলেন না বলে প্রায়ই আমরা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। দীক্ষিত ভয় পাচ্ছিলেন সূর্যালোক সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হলে, আমাদের এতক্ষণের একত্র থাকার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে রাখার চমৎকার এক বুদ্ধির উদয় হল দীক্ষিতের মাথায়। আমাদের লাইফ-জ্যাকেটে অতিরিক্ত এক ফুট করে স্ট্র্যাপ ছিল। সেইগুলো দিয়ে আমরা নিজেদের বেঁধে নিলাম। শক্ত

ক্যানভাসের স্ট্র্যাপ ; তাই ছিঁড়ে যাওযার ভয় নেই। বাঁধার পর আমাদের নড়াচড়ার জন্যে বেশ জায়গা রেখে দেওয়া হয়েছিল। এর পর আমরা যেমনই সাঁতার কাটি না কেন দুজনে একত্রই রইলাম। আমাদের হাতের আঘাতেও এক ধরনের সৌভাগ্য সূচিত ছিল। আমার ক্ষতগ্রস্ত বাঁ হাত আর দীক্ষিতের ডান হাত পাশাপাশি ছিল। আমরা একত্রে তার ব্যবহার করতে লাগলাম। অক্ষত হাত আর পা দুটি একযোগে ব্যবহার করে আমাদের গতিপথ সমান্তরাল রাখা যাচ্ছিল।

কোনো শক্তিশালী স্রোত আমাদের তীরে পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে এই নিষ্ঠুর সত্য সম্পর্কে আমরা ক্রমে সচেতন হলাম। যে দূরত্ব দু ঘণ্টার মধ্যে পার হয়ে যাব, প্রথম দেখেই মনে করেছিলাম, তা অল্পও কমেছে বোধ হল না। এ কথা বুঝতে পেরে দীক্ষিত বললেন, "পাঠকের সঙ্গে আমাদেরও থাকা উচিত ছিল।" আমি মতান্তর জ্ঞাপন করি, বলি, "পাঠক আমাদের চেয়ে ভালো সাঁতার দেয়। অমন করার অর্থ হত : তার দ্বীপে পৌঁছনো অকারণে বিলম্বিত করা।" দীক্ষিত সে যুক্তি স্বীকার করে নিলেন।

গোধূলির আলোর বেশ দ্রুত মুছে যাচ্ছিল আর সমাসন্ন ভয়ঙ্কর অন্ধকারের ছায়া নেমে আসছিল। আকাশের প্রান্তে কয়েক খণ্ড ছোট মেঘ ভাসছিল ; তারাও রক্তিমাভা মুছে নিরালোকের সেই ভয়াবতার রূপে সেজে নিচ্ছিল। দ্বীপের সবুজ বনশ্রেণী মসীকৃষ্ণ রেখার মতো। দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেট আর বহুদূরে সরে যাওয়া জ্বলন্ত পেট্রলের অবশেষটুকু শুধু আলোর উৎস। তখন বোধগম্য হল, সূর্যকিরণ কত বড়ো সহায়। লক্ষ্য মুছে গেছে চোখ থেকে আর স্থিরীকৃত দিকে যাওয়া কঠিন মনে হল। যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারছিলাম, কোনো বিপত্তি ওত পেতে বসে নেই আশেপাশে, তবু অন্ধকারের গহ্বর থেকে ভয় এসে অধিকার করছিল আমাদের। নরখাদক জলচরেরা এবার শিকারে বার হতে পারে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের এত ঘণ্টার লড়াই সাঙ্গ করে দিতে পারে।

আশানুরূপ স্বল্প সময়ে আমাদের এ সংগ্রাম শেষ হবার নয়। দ্বীপে উপস্থিত হতে স্রোতের দরুন দেরি হতে পারে, আমরা জানতাম। শক্তি নিঃশেষিত না করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সাঁতরে যেতে পারব এমন ভাবেই চলা উচিত আমাদের। অন্তত সকাল অবধি টিকে থাকতে হবে, যখন সাহায্য এসে পৌঁছতে পারে। গতি মন্থর করে, নিশ্চিত বিক্ষেপে, হাত আর পা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

দিগন্তে জ্বলন্ত তেল নিঃশেষ হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘনীভূত হলে দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেটের আলো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, আর, দশ বা কুড়ি ফুট ব্যাসে এক আলোর বৃত্ত জলের ওপরে রচনা করল। দ্বীপের ছবি আরো অস্পষ্ট হয়ে গেল। জামাকাপড় পড়ে সাঁতার কাটা কষ্টসাধ্য বোধ হচ্ছিল। পাঠক কাছে থাকতে যে উপদেশ দিয়েছিল সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের ট্রাউজার খুলে ফেললাম। টাকাকড়ি, ব্যাগ চশমা, চাবি -সবই প্যান্টের সঙ্গে ফেলে দিতে হল। ট্রাউজার ছেড়ে ফেলা মাত্র জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল ; অবশ্য কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রাউজার তাপটুকু বজায় রাখতে সাহায্য করছিল। কিন্তু দেহ ক্রমে নতুন তাপমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল, আর অস্বস্তি দূর হল। গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রকে ধন্যবাদ দিলাম এই সহনীয় উত্তাপের জন্যে। এ যদি উত্তর সাগর হত, আমরা এতক্ষণে ঠাণ্ডায় জমে মারা যেতাম।

নির্বাচিত দিকে সরাসরি এগিয়ে চলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গ্রেট নাতুনার অনুচ্চ তটরেখা ঘন কালো অন্ধকারে অতি অস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়। লাইফ-জ্যাকেট বুকের ওপরে বাঁধা ছিল বলে চিত হয়ে ভাসতে হচ্ছিল আর পেছন ফিরে সাঁতার কাটতে হচ্ছিল। প্রায় ১৮০° ডিগ্রী ঘাড় ফিরিয়ে তীরের দিকে দেখে আন্দাজ করতে হচ্ছিল আমাদের অগ্রগতি। এ এক কষ্টকর পদ্ধতি। মোটামুটি নিজেদের ঈপ্সিত দিকের পানে যাবার জন্যে চোখের সামনে একটা দিকনির্দেশক স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন। সালোর দ্বীপের পাহাড়গুলি এই

নির্দেশে চমৎকার সাহায্য করছিল। দীক্ষিত আর আমি পাহাড়টিকে চোখের সামনে পেছনে সাঁতার কেটে যাচ্ছিলাম। প্রত্যেক আধঘণ্টা অন্তর দীক্ষিত প্রশ্ন করছিলেন, "কারনিক, আর কতদূর যেতে হবে?" আমি সেই কষ্টকর ১৮০° ডিগ্রী ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর করছিলাম, "আর একশোগজ হবে।" বার তিন-চার এর পুনরাবৃত্তির পর দীক্ষিত রসিকতাটা ধরতে পারলেন। আমি জানতাম দ্বীপটি এক ইঞ্চিও কাছে আসে নি। কিন্তু মনোবল বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। কারণ পৈশাচিক বিরূপ এই খর স্রোতের বিপত্তিকে জয় করার তাই একমাত্র পথ।

সোজা যাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল। দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেটের আলোটা চোখে বিঁধছিল। তারই জন্যে সালোর দ্বীপের ও পাহাড়ের অস্পষ্ট দিকনির্দেশকটির পানে দেখা চোখের পক্ষে রীতিমত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। কাজের অযোগ্য বাঁ হাতের আড়াল দিয়ে চোখটা বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম। অমন অবস্থায় হাতখানা সারাক্ষণ তুলে রাখা যায় না, তাই চোখ-ধাঁধানো ওই ছোট আলোটাকে সহ্য করতেই হচ্ছিল।

পাহাড়ের আবছা সীমারেখা দেখার জন্যে অনবরত আমাদের মাথা তুলে দেখতে হচ্ছিল। তাতেই নিরতিশয় ক্লান্তি আরো বেড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে পরে আমরা তখনকার মতো দিকনির্দেশকের ভুলে সজোরে হাত আর পা ছুঁড়ে যাচ্ছিলাম। ফলে পথ থেকে সরে যাচ্ছিলাম; এমনকি একশো ডিগ্রী বাইরেও। ভুল সংশোধন করতে আবার অনেক শ্রম আর শক্তির অপব্যয় হচ্ছিল। মনে তখন একমাত্র উদ্দেশ্য—"চেষ্টা করে চল।' আবার কালপঙ্গি শুরু হল। মাথা তুলে দূর পাহাড়ের দিকে দ্যাখো আর হাত-পা চালিয়ে যাও। ঘাড় একটু সরালেই বিপথে সরে চলে যাবে। মাঝে মাঝে দীক্ষিত চিৎকার করে বলছিলেন, "কারনিক, আমার মনে হয় আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি না।" তারপর সাঁতার কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত রেখে সেই স্থাননির্দেশক চিহ্নের সন্ধান করা। হতাশ হয়ে দেখি আমরা ঠিক বিপরীত দিকেই

চলেছি। ভ্রম সংশোধন করে যাত্রা আবার শুরু করাই একমাত্র বিকল্প পন্থা। বার বার এমন ঘটল। গ্রেট নাতুনা এত নিকটে দেখালেও দূরেই থেকে গেছে।

দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেটের বাল্‌বই একমাত্র আলোর উৎস। কী ঐন্দ্রজালিক ঐশ্বর্য ছিল ওই ছোট বাল্‌বটিতে। যখন ঘন অন্ধকারের ভয়াবহতায় ঈপ্সিত পথের হদিশ ছিল না, তখন সে ছিল আমাদের সুহৃদোত্তম, সহায়ক। অন্ধকারের ভয়াবহ মূর্তি তার বুকে চেপে বসছিল না। ক্ষুদ্র বাতিখানিই আশার আলো নিয়ে জ্বলছিল। ওই বাল্‌বের আলো, তথা সেই আশার আলো, আমাদের কিরণসুধা বর্ষণ করছিল। আমাদের শরীর আলোকিত আর দৃষ্টিগোচর ছিল বলেই লাইফ-জ্যাকেটের স্ট্র্যাপের বাঁধনের চেয়ে দৃঢ়তর বাঁধনে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল।

কথাবার্তাই হল একঘেয়েমির প্রতিষেধক। সাহায্য আসতে বা দ্বীপে পৌঁছতে, যদি ভাগ্যক্রমে তা ঘটে, তাহলেও তার বহু সময় লাগবে ; এ সম্পর্কে আমরা সচেতন হলাম। মৃত্যু যদি বা নিয়তি হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তির পীড়নে সে আসবে অতি ধীরে পদক্ষেপে ; তার এখনো বিলম্ব আছে। পাশাপাশি যুদ্ধ করার দীর্ঘ সহতীর্থে আমাদের পরস্পরের কথা যুগিয়ে দিল। নিরপরাধদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের তীব্র ক্ষোভ আর ঘৃণা প্রকাশ করি। এখনো পর্যন্ত চোদ্দটি জীবন তার কবলে পড়েছে। যদি আর কোনো বড়ো নূতন বিপদের সম্মুখীন না হতে হয়, পাঠক দীক্ষিত আর আমি জানতাম যে এই কাহিনী বিবৃত করার জন্যে আমরা জীবিত থাকব। শেষের দুজনের অবস্থার কথা আমাদের জানা ছিল না, সম্প্রতি আমরা তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম। আমি দীক্ষিতকে বললাম, "যদি আর তিন মিনিট বিমানখানা ভেসে থাকত, আমি বাজি রাখতে পারি, আমরা সবাইকে বাঁচাতে পারতাম।"

দীক্ষিত শুধু বললেন, আমারও তাই বিশ্বাস।

এ-সব অহেতুক মনভোলানো ভাবনা। যে বিমান সোজা হয়ে উড়তে পারে না, কাশ্মীর প্রিন্সেসের মতো বিপর্যয় তাব ঘটবেই। শুধু এইটুকু ভাগ্যের কথা যে, কয়েকজন জীবিত রইল এই রহস্যাবৃত বিমান বিধ্বংসের কারুকর্মীদের মুখোস খুলে দিতে, দুঃসাহসী বৈমানিক ইঞ্জিনীয়রিং ডিপার্টমেন্ট—এঁদের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়ে আর এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশানালের তথা ভারতের যে সম্মান ও জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছে, তার কলঙ্ক স্খালন করার জন্যে। কিন্তু পৃথিবীর কাছে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

দীক্ষিত আর আমি বিস্ফোরণের পর থেকে বিমানটির গতিবিধি আর ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করলাম। তারপর দীক্ষিত বললেন, "আমার স্ত্রী আর পুত্র ছেলে দারুণ ভাগ্যবান, আমি এখন মরলে শুধু যে তারা আমাকেই হারাত তাই নয়, ইনসিওরেন্সের তরফ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণও পেত না, কারণ আমার ইনসিওরেন্স পলিসিতে আমি বৈমানিক বিপত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করাই নি।"

"কী সর্বনাশ ডিকি," আমি বললাম, "তোমার এমন মারাত্মক ভুল করা উচিত হয় নি। বম্বেতে পৌঁছে তোমার প্রথম কাজ হবে পলিসির ঠিকমত সংশোধন।" তিনি কথা দিলেন যে তাই করবেন।

পরে আমি দীক্ষিতকে বললাম, "বিমান নিখোঁজ হওয়ার খবর বেতারে প্রচার করে থাকবে ইতিমধ্যে, সম্ভবত আমাদেরও মৃতের মধ্যেই গণ্য করা হবে। বাড়ির লোকেদের নিশ্চয়ই বেশ কিছুকাল যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।" আমার চোখে জল এসে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ, আত্মীয়স্বজনদের কথা মনে পড়ায়, আমাদের কথাবার্তা বন্ধ রইল।

বাবার ডায়রিতে লেখা আছে :

"পুনা, ১১ই এপ্রিল, ১৯৫৫

পুনা-কেন্দ্র রেডিওতে বাজছিল। নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার শুরু হল…'অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও। খবর পড়ছেন…" বেতার সংবাদ সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কেউ শুনছিল। কিন্তু সকলের কান সেদিকে

ফিরল, যখন বলতে শুরু করল···একটি এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টার-ন্যাশনালের কনস্‌টেলেশন বিমান হংকং থেকে জাকার্তার পথে স্বারাক্‌-এর উত্তরে, দক্ষিণ চীন সাগরে নিখোঁজ হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে···

পরিবারস্থ সকলে জানত যে অনন্ত প্রায়ই আকাশযাত্রায় বার হত। কিন্তু, এই বিমানে সে ছিল কিনা, সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। তার আসন্নপ্রায় বিবাহের কথাবার্তার উৎসাহ সহসা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হল। প্রত্যেকেই আশা করে ছিল যে সে ঐ বিমানে ছিল না, তবু অনর্থের আশঙ্কা উদয় হচ্ছিল। সম্পূর্ণ সংবাদ প্রচারটা গভীর মনোযোগসহকারে সকলে শুনলাম যাত্রী আর চালকদের নাম ঘোষণার প্রত্যাশায়। আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু তা নিরসনের কোনো উপায় তখন ছিল না। প্রার্থনা, আশা আর দুশ্চিন্তায় আমরা ডুবে রইলাম। সকালের সংবাদপত্রে আরো বিশদ বিবরণী পাওয়া যাবে এই প্রত্যাশায় আমরা অস্বস্তি আর আশঙ্কা নিয়ে শুতে গেলাম।"

দীক্ষিত নিজের স্ত্রী আর ছেলেদের কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁর বড়ো ছেলে ভারতচন্দ্রকে তিনি কথা দিয়ে এসেছেন যে ফেরার সময় তাকে একটা ভিউ-মাস্টার স্টেরিওস্কোপ কিনে দেবেন। দীক্ষিত বললেন, 'ছেলের কাছে প্রতিজ্ঞা রাখতেই হয়, ঠিক কি না ? বাড়ি আমায় ফিরতেই হবে আর ওর জন্যে একটা ভিউ-মাস্টার নিয়ে যেতে হবে।"

বম্বেতে ক্যাপটেন নাদকারনি দীক্ষিতের পরিবারস্থ সকলকে তার কুশল আশা করে সাহস দিচ্ছিল। ন বছরের ছেলে ভারতচন্দ্র বলছিল যে তার বাবা কখনো মিথ্যে কথা বলেন না। সে বলছিল, "হংকং যাবার সময় তিনি আসবেনই।" সে আরো বলে, "আর, জানো, এবারে উনি আমায় একটা "ভিউ-মাস্টার এনে দেবেন ? নাদকারনি কাকা, বাবা ভিউ-মাস্টার নিয়ে এলে তুমি আসবে বাড়িতে ? আমি তোমাকে "চন্দ্রলোকে যাত্রা" দেখাব। উচ্ছ্বসিত হয়ে তার বাবার প্রত্যাবর্তনের কথাই বলে চলছিল। জানত না, তখন দীক্ষিত কী দুর্যোগের কবলে।

সংবাদ ঃ বান্দুং-এর এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে যাবার সময়ে চীন

গণতন্ত্রের প্রতিনিধিবর্গ আর সাংবাদিকদের এগারোজন যাত্রীসহ আটজন বিমান-কর্মী এয়ার-ইণ্ডিয়া ইনটারন্যাশনালের কাশ্মীর প্রিন্সেস বিধ্বস্ত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

বিমানটি তিনবার (এস. ও. এস.) বিপদজ্ঞাপক সূচনা পাঠায় কাচিং-এর ১০৮ মাইল উত্তরে তার অবস্থানের কথা জানিয়ে। ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময় তিনটের সময় বিপদ জ্ঞাপনের পরই বিমানটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। এস. ও. এস. পাঠাবার আট মিনিট আগে সে তার অবস্থান সম্পর্কে জানায়; কিন্তু কোনো গোলযোগের ইঙ্গিতও জানায় নি। দুর্ঘটনার কারণ অজ্ঞাত...

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বম্বে।

নিউ দিল্লী, এপ্রিল ১২, ১৯৫৫

দুর্ঘটনায় গভীর বেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেন: চীন থেকে জাকার্তা যাবার পথে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের কনস্টেলেশন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এ সংবাদ আমি প্রথমে প্রায় সাতটার সময়ে পাই। আমি মর্মাহত হয়েছি। এমন নিদারুণ দুর্যোগ যে কোনো সময়েই দুঃখজনক। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে, চীন গণতন্ত্রের প্রতিনিধিবর্গকে বান্দুং কনফারেন্সে নিয়ে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা আরো বিশেষভাবে বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক ...এই দুর্ঘটনার কতকগুলি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আছে। সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার দশ মিনিট আগেও এর কাছ থেকে স্বাভাবিক বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গিয়েছিল। তারপরই সহসা কিছু একটা ঘটে থাকবে...”

দীক্ষিত ঘড়ির দিকে তাকালেন। নটা বেজে গেছে। জলের মধ্যে আমরা চার ঘণ্টার বেশী কাটিয়েছি। এতক্ষণে সারা পৃথিবীতে খবর পৌঁছে গেছে যে কাশ্মীর প্রিন্সেস জাকার্তায় পৌঁছয় নি। জাকার্তায় পৌঁছবার সময় দু ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। সকলে নিশ্চয়ই মনে করেছে যে সমুদ্রের গর্ভে সে ডুবে গেছে।

দীক্ষিত তখন বললেন, “আশা করি, ক্যাপটেন জাতার আর গ্লোরিয়াও

এখন বেঁচে আছে। জাতার এত শান্ত আর সাহসী। গ্লোরিয়ার কাছে আমি আমার প্রাণের জন্যে ঋণী। সাহসী মেয়ে। সে-ই আমার গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে দিয়েছিল।" দীক্ষিত যখন কক্‌পিট থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন, জাতারও পারতেন···আমরা ভাবলাম··· যদি তিনি আহত না হয়ে থাকেন। সম্ভবত তিনি আহতই হয়েছিলেন। জাতার দীক্ষিতের চেয়ে মোটা ছিলেন আর তাই দীক্ষিত যে জানালা বেয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন সে জানালা দিয়ে বেরোনো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া যে রকম বেগে বিমানটি জলের ওপর আছড়ে পড়েছিল, তার ধাক্কায় কারোর মুখ কঠিন কোনো জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া আশ্চর্য নয়, ফলস্বরূপ, তখন না হলেও জ্ঞানহীন অবস্থায় পরে তিনি জলে ডুবে প্রাণ হারাতে পারেন। প্রাণরক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তবু অসম্ভব নয়। ক্যাপটেন জাতারের মতো এমন একজন সাহসী সুন্দর মানুষ বেঁচে আছেন, এ আশা না করে পারলাম না।

এতক্ষণে বিমান ধ্বংসের পূর্বেকার ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করার সময় পেলাম। প্রশংসনীয় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন বিমানের সকলেই। বিশেষত দ্রুতপ্রসারী আগুনের মুখে জাতারের বিমানটিকে নামিয়ে ফেলার এমন ত্বরিত সিদ্ধান্ত। পেট্রল ট্যাঙ্কে যে-কোনো সময় বিস্ফোরণ হতে পারত। আগুন লাগার পর বিমানের আর সোজা ওড়ার ক্ষমতা ছিল না। জাতার আর দীক্ষিত বিমানকে যথাসম্ভব সোজা পথে পরিচালিত করার জন্যে প্রাণপণ করছিলেন। নতুন নতুন সমস্যার সঙ্গে বিপদ বৃদ্ধি পেতে লাগল। আগুন ছড়িয়ে পড়ে হাইড্রলিক ব্যবস্থা অকেজো করে দিয়েছিল। জল পর্যন্ত পৌঁছবার ঠিক আগেই তৃতীয় ইঞ্জিন আর ডানদিকের কেবিনহীটার পর্যন্ত আগুন প্রসারিত হয়েছে। তার অর্থ, পাইলট দুজনের ওপর আরো কাজের চাপ। হাইড্রলিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ হল ওই ভীষণ দ্রুত ল্যাণ্ডিং স্পীডে বিমানের 'কণ্ট্রোল' চালনায় আরো শ্রম ও শক্তি নিয়োগ। তিন নম্বর ইঞ্জিনে আগুন প্রসারিত হওয়ায় তাকে বন্ধ করে দিতে হল, ফলে তার

আকাশে ওড়ার অবস্থার অবনতি ঘটল। বিপত্তির এমন একত্রে সমাবেশ এখনো আকাশচারণে লিপিবদ্ধ হতে বাকি আছে।

গ্রেট নাতুনা দ্বীপের তীরের পানে আমরা অবিরত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে চলি। সহসা শীতলতর জলে এসে পড়লাম। তাপমানে লক্ষণীয় তারতম্য ছিল। আমি বললাম, "দীক্ষিত, দেখেছ কি, আমরা এখন ঠাণ্ডা জলের মধ্যে এসে পড়েছি?"

"ঠাণ্ডা জল মানেই, আরো গভীর সমুদ্রে···" দীক্ষিত বললেন। আতঙ্কের একটা কম্পন আমাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। গভীর সমুদ্র আশা করি, তা নয়---আমি মনে মনে বললাম। ভাঙা কলারবোনের জন্যে দীক্ষিতের পক্ষে ঘাড় ফিরিয়ে গ্রেট নাতুনা দ্বীপের তীরের দিকে দেখার উপায় ছিল না। স্বভাবতই এ দায়িত্ব আমার। দীক্ষিতের সাবধানতার সঙ্কেত শুনে আমাকে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে হচ্ছিল, সমীপবর্তী তটরেখা আর দ্বীপপুঞ্জ আমাদের মনের দুঃস্বপ্ন-প্রসূত, না কি শীতলতর জলের আর অন্য কোনো কারণ আছে। সহসা কোনো সিদ্ধান্তে আসার পরিবর্তে কিছুকালে অপেক্ষা করাই স্থির করলাম। স্বল্পক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম যে বহু চেষ্টায় আমরা শীতল জলে এসে পড়েছি, আর কিছুক্ষণ শৈথিল্যই আবার উষ্ণতর জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। দুঃস্বপ্নের আশঙ্কা কাটিয়ে উঠলাম। সিদ্ধান্ত করলাম যে, শক্তিশালী একটি শীতল জলের প্রবাহ গ্রেট নাতুনার কাছাকাছি দিয়ে বইছে। দীক্ষিতকে বললাম, আর তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন।

চার ঘণ্টার বেশী সংগ্রাম করে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিও, -বরং বলি, জলও—অধিকার করতে পারি নি। আমরা স্বল্পতম দূরত্বও অগ্রসর হতে পারি নি। দীক্ষিত হতাশস্বরে বললেন, "কারনিক, বরং এসো শুধু ভাসতে থাকি আর বিশ্রাম নিই। আমরা কোথাও যেতে পারছি না।" আমিও ভাবলাম, সত্যি কি আমরা নিষ্ফল চেষ্টা করছি। হয়তো শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ভেসে থাকতে পারব। নিশ্চেষ্ট হয়ে ভেসে থাকা—বড়ো সুখের প্রস্তাব, কিন্তু বিপজ্জনক। আমরা অধিকতর

শীতল জলের প্রবাহে গিয়ে পড়তে পারি। সম্ভবত এই প্রবাহ গভীর সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। তা ছাড়া, আমার জানা ছিল, যে অঙ্গ চালনায় হিংস্র জাতের জলচরদের দূরে সরিয়ে রাখা যায়। যতক্ষণ শরীরে শক্তি আছে, ততক্ষণ জলের ওই দানবদের সহজ শিকার হতে চাই না আমি। এই সব বিবেচনা করে আমি দীক্ষিতকে বললাম, "বিমানের থেকে প্রাণ নিয়ে এসে এখন মরার কোনো মানে হয় না। দ্বীপে পৌঁছবার আগে আমি থামছি না। কিন্তু ক্লান্তি বোধ করলে তুমি বিশ্রাম নিতে পার। কিন্তু আমাকে থামতে বোলো না। একটা দ্বীপ পর্যন্ত তোমাকে আমি টেনে নিয়ে যাব।" ইতিমধ্যে দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দীক্ষিত প্রস্তাব করলেন, "দুজনে পালা করে ঘুমোনো যাক।" প্রশংসনীয় ভাবেই সুমতলব—আমি ভাবলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করে সে প্রস্তাব বাতিল করে দিলাম। গভীর ঘুমে ডুবে যাওয়ার যে ভয় আছে। দীক্ষিতকে কিছু না জানিয়ে, তাঁকে ঘুমোতে বললাম; ততক্ষণ আমি জেগে নজর রাখব। কিন্তু তাঁর পক্ষেও ঘুমানো অসম্ভব ছিল, আমাদের জীবন মরণ এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে। বড়োজোর তিনি চুপ করে পড়ে থাকতে পারছিলেন, পেশীগুলোকে শিথিল করে আর কোনো চিন্তা না করে। যত কম শব্দ করে পারা যায়, আমি শুধু ডান হাতটা নেড়ে যাচ্ছিলাম। দীক্ষিতকে সঙ্গে টেনে নিয়ে শামুকের গতিতে আমি যাচ্ছিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, "তুমি সাঁতার দিচ্ছ নাকি, কারনিক ?" "না ডিকি···" আমি জবাব দিলাম, "সাঁতার নয়, শুধু এক হাত চালিয়ে চলেছি···। তুমি আরো খানিকক্ষণ বিশ্রাম করো। আমি এখন থামতে পারি না। দ্বীপে পৌঁছানোর পরই আমি থামব।" আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দীক্ষিত নতুন উদ্যমে, আমার আপত্তি সত্ত্বেও, আবার সাঁতার দিতে শুরু করলেন।

সাঁতার কাটতে কাটতে আমি ভাবছিলাম এত শক্তি আমরা পেলাম কোথা থেকে। ঘুম নেই, খাবার বা জল নেই— যা আমরা করে চলেছি, তাতেই আশ্চর্য বোধ হল। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের এমন

'এনডিওরেন্স সুইমিং'এর জন্যে বলা হলে, (স্বাভাবিক অবস্থা অর্থে প্রয়োজনীয় খাবার আর জল, আর চারিপাশে সাহায্যার্থী থাকলে) আমি অনেক আগেই জল থেকে উঠে আসতাম। এ ধাঁধার উত্তর হল : বেঁচে থাকবার ইচ্ছে। এই কঠিন বিপর্যয়ের মুখে পড়ার আগে, বেঁচে থাকবার ইচ্ছে যে কত প্রবল হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না।

সাঁতার কেটে আমরা একবার এগিয়ে আর একবার পেছিয়ে যাচ্ছিলাম। বেগবান ওই শীতল জলের প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসার শক্তি আর ছিল না। তীরে পৌঁছবার আশা ছিল না বললেই চলে। সাঁতার কাটা খুব কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। আলস্যে ভেসে থাকার প্রস্তাব অতি লোভনীয়। তবু তেমন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও ছিল না। দীক্ষিত বললেন, "এখন মৃত্যু অতীব শোচনীয় হবে···বিমান থেকে জীবন্ত বার হয়ে এলাম···।" আমি ওঁকে বললাম, "দুঃখের কথা বই কি? তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সূর্যোদয় পর্যন্ত আমাদের শক্তি বজায় থাকবে, আর তার মধ্যে সাহায্য এসে পৌঁছতে বাধ্য···"

তখন প্রায় রাত সাড়ে নটা। পরের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত সাঁতার দেওয়ার অর্থ, তখন সাহায্য এসে পৌঁছলেও প্রায় আরো ন ঘণ্টার জীবন-মরণ সংগ্রাম। সাহায্যের আশা আমাদের করতেই হবে, তবু যখন এসে পড়বে তার চেয়ে আগে আশা করার মতো অমন আশাবাদী না হওয়াই ভালো। বিমান থেকে ভুল জায়গায় সন্ধান চালিয়ে আমাদের নিয়তির হাতে সঁপে দেওয়ার কঠোর সম্ভাবনার জন্যেও আমাদের তৈরী থাকা উচিত।

উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে দীক্ষিতের মনে আশা ছিল। অধ্যবসায়ের সামর্থ্য সম্পর্কে খুব আশাবাদী হবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয়, কোনো সন্ধানী বিমান এখনি এসে পড়বে।" আর একটা বিমানের গুঞ্জন দূর থেকে ভেসে কানে আসতেই কী উত্তেজনা আর আশা যে মনে জেগে উঠল! দীক্ষিতের মুখ আনন্দে

উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হয়তো অনতিবিলম্বে আমরা মনুষ্যসমাজে আবার ফিরে যাব, আত্মীয়-বন্ধু শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। সেই তো এখন বিমানের সব কর্মী আর যাত্রীদের আত্মীয়-বন্ধুদের একমাত্র মনোবাসনা। গুঞ্জন স্পষ্টতর হল, ক্রমে মাথার ওপর এল, ডানার প্রান্তের লাল-নীল বাতিগুলি আমরা দেখলাম। এই বিমানটির তা ছাড়া পেটের কাছে অতিরিক্ত দুটি আলো ছিল; তার মানে, এ বিশেষ অভিযানে নিযুক্ত। পারিপার্শ্বিক অন্ধকারে দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেটের আলো ওদের চোখে পড়ার মতো।

আমরা আশা করছিলাম, বিমানটি চক্রাকারে ঘুরবে বা নিচে নেমে এসে অবশিষ্ট দুর্গতের খোঁজ করবে। তেমন কিছুই সে করল না, উত্তর-পূর্ব দিকে সোজা পাড়ি দিল। আমাদের শোচনীয় দুর্ভাগ্যে দুজনেরই বিতৃষ্ণা জন্মাল আর বিরক্ত বোধ করলাম যে একবারও না ঘুরে বিমানটি এমনি ভাবে চলে গেল। আমি আশ্চর্য হলাম যে, দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেটের আলো এমন ভাবে উপেক্ষিত হল। তিক্ততায় দীক্ষিতকে বলে ফেললামঃ "আমাদের বেশী আশা করা উচিত নয়। আমার মনে হয় নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদের দ্বীপে পৌঁছতে হবে।"

সামনের পাহাড়কে দিক্‌দর্শক মনে করে সাঁতার কাটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেটের আলো অত্যন্ত কাছে থাকার দরুন চোখে ভীষণ লাগছিল। সারাক্ষণ প্রার্থনা করছিলাম পরিচিত একটি তারা আকাশে দেখা দিক। অন্ধকার ঘন হয়ে গেলে, পশ্চিম দিগন্তের কিছু ওপরে সুন্দর একখানি নক্ষত্র,—কালপুরুষ দেখা দিল। আমাদের বিশেষ কোনো কাজে লাগার পক্ষে অনেক নিচে ছিল সে। আধঘণ্টা পরে আকাশের এই সুহৃদোপম আলোকবিন্দুটি আমাদের ত্যাগ করে পশ্চিম দিগন্তের অন্তরালে চলে গেল। কিন্তু অনতিবিলম্বে বৃহস্পতি আমাদের ঠিক মাথার ওপরে দুটি ছোট তারাকে সঙ্গে নিয়ে দর্শন দিল। তারা তিনটিতে একটি নিখুঁত ত্রিভুজ রচনা করেছে, তার শীর্ষদেশ গ্রেট-নাতুনার পানে।

পরে, অনেক দিন রাত্তিরে, আমাদের বাসার সামনের লনে শুয়ে শুয়ে আকাশের এই ত্রয়ীকে দেখেছি আর সেই ভয়াবহ রাতের স্মৃতিতে আতঙ্কিত হয়েছি। কী আশ্চর্য ভাগ্য, আমি অনেক সময়ে ভেবেছি, বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি আমাকে কোনো একদিন জীবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। দূর মহাশূন্যে সে প্রবলবেগে ঘুরছিল। হ্যাঁ, বৃহস্পতি অসাধারণ বেগে ঘুরছিল, কিন্তু আমাদের বোধ হচ্ছিল যেন তুইজন সহযোগী সমভিব্যাহারে সে আমাদের আকাশ থেকে নির্দেশ দেবার জন্যই দাঁড়িয়েছিল। স্বর্গীয় দান, মনে হল আমাদের। উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি দীক্ষিতকে দেখালাম, 'ওই ত্যাখো, বৃহস্পতিকে বাঁ দিকে রেখে ওই ত্রিভুজ, তীরের দিকে ও নির্দেশ করছে।"

"তাই তো, হ্যাঁ,"...দীক্ষিত বললেন, "অস্পষ্ট পাহাড়গুলোর দিকে কষ্ট করে আর আমাদের তাকাতে হবে না।" দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেটের আলো আর আমার চোখে যন্ত্রণা দেবে না। আমরা এতক্ষণে প্রথম মাথা নামিয়ে ঘাড়টা সোজা করতে পারলাম। এর জন্যে আমাদের গতিবেগও খানিকটা বেড়ে গেল।

অকারণ কৌতূহলে আকাশে তারার দিকে আমি একসময়ে তাকিয়ে থাকতাম। কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি যে, একদিন জ্যোতির্বিদ্যায় এই অল্পজ্ঞান আমার জীবন রক্ষা করবে।

গতিবেগে বর্ধিত হওয়ার গ্রেট নাতুনায় শীঘ্রতর পৌঁছবার আশা নতুন করে মনে উদয় হল। শীতল থেকে উষ্ণতর আর উষ্ণ থেকে শীতলতর জলে সাঁতার কাটা অব্যাহত রইল। প্রবল প্রবাহের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার শক্তি-সামর্থ্য আর ছিল না! স্রোতের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্তিতে সহনসীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল; বিশ্রাম করতে গিয়ে আবার যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম সেখানে ফিরে যাচ্ছিলাম। বিশ্রামের সময়ে দীক্ষিত অবশিষ্ট দূরত্বের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি ভালোমতই জানতাম যে আমরা একটুও এগোই নি। দীক্ষিতও তা জানতেন। এ ব্যাপারে একমত হওয়ার অর্থ হত—প্রয়াস

পরিত্যাগ করা, তাই আমি মনোবল বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মতান্তর প্রদর্শনই যুক্তিযুক্ত বোধ করলাম। দীক্ষিতের প্রশ্নে বাঁধা উত্তর দিচ্ছিলাম, "মাত্র আর একশো গজ।" শুনে শুনে দীক্ষিত এক সময়ে বললেন, "তোমার একশো গজ এত দূর বোধ হচ্ছে···"

কখনো কখনো খুব অস্পষ্ট উত্তর দিচ্ছিলাম: "আর এই সামান্য দূর···।" অবিসংবাদিত ভাবেই দূরত্ব যৎসামান্য, তবু তা যেন মৃত্যু-দূতের প্রখর প্রহরায় সুরক্ষিত।

খানিক বিশ্রাম করতে গিয়ে আবার আমরা শীতল প্রবাহের কবলে পড়লাম। দীক্ষিত আমাকে পাখির ডাক শুনতে বললেন। শব্দের জন্যে একাগ্র হয়ে রইলাম। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে কাকলী। "অর্থাৎ, কাছেই দ্বীপ," দীক্ষিত বললেন। যদি ছোট পাখির ডাক শুনতে পাবার মত দূরত্বে এসে থাকি, তাহলে আমরা দ্বীপের খুব কাছেই এসে পড়েছি। আর পাঠক অবশ্যই দ্বীপে পৌঁছে গেছে। আশাকরি জ্ঞান হারিয়ে সে সমুদ্র-সৈকতে পড়ে নেই। দীক্ষিত আশা করছিলেন যে, সে সাহায্য পেয়ে আমাদের উদ্ধারের জন্যে আসবে। আমি অত আশান্বিত হই নি। অপর দুজনকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা, সূর্যাস্তের পর তাদের আর দেখি নি। তমসার রাজ্যে আমরা ভাসছিলাম। সেখানে আর-একটি আশার রশ্মি নিয়ে এল পাখির কাকলী।

ওই কাকলীধ্বনি এত ক্ষীণ যে নিথর নিস্তব্ধ হলেই কানে আসে। হাত পা নাড়তে শুরু করলেই জলের শব্দে তা ডুবে যায়। এরপর আমরা এক আতঙ্কজনক আবিষ্কার করলাম। আমাদের লাইফ-জ্যাকেট বেশ নরম হয়ে এসেছে। অর্ধেকের বেশী বাতাস 'লিক' করে বেরিয়ে গেছে। স্রোত থেকে সরে অল্প বিশ্রাম নিলাম। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে মুখে বাতাস ভরার যে ব্যবস্থা আছে তাতে ফুঁ দিলাম। ভয়ের শিহরণ শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। এই 'লিক' যদি বেড়ে যায়, পরে আমরা এমন ভীষণ ক্লান্ত অবস্থায় থাকব যে আর জ্যাকেট

ফুলিয়ে নিতে পারব না। ফুলিয়ে নিতে হলে জ্যাকেটের ভেতরে যে চাপ আছে তারচেয়ে বেশী জোরে ফুঁ দিতে হবে। একবার যদি আমাদের শক্তির পুঁজি ফুরিয়ে যায়, আর বিশ্বাসঘাতকতা করে জ্যাকেটের বাতাস যদি বার হয়ে যায় তাহলে আমাদেরও তলিয়ে গিয়ে অপর সকলের পাশে সলিলসমাধিতে শয্যা নিতে হবে।

পাখির ডাকের এই প্রলোভন আরো কিছুক্ষণ চলল। একবার, স্রোত থেকে সরে এসে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি, তখন স্পষ্ট শুনতে পেলাম ওই শব্দ। এরই কাছ থেকে আরো ভালোভাবে ভাববার শক্তি পেলাম। কিন্তু তবু পাখির ওই ডাক লাইফ-জ্যাকেটের 'লিক্'-এ দেখা দেওয়া দুর্যোগের আতঙ্ক প্রশমিত করতে পারে নি। আমি ত্রস্ত হাতে 'লিক্'এর জায়গাটা সন্ধান করতে লাগলাম, আর ঘনীভূত বাতাসের বোতল যেখানে জ্যাকেটের সঙ্গে লাগানো থাকে সেখানে তার সন্ধান পেলাম। বাতাস আরো দ্রুত 'লিক্' করে যাওয়ার প্রতিষেধক হিসেবে বাঁ হাতের তালুতে আমি ওই জায়গাটা চেপে ঢাকা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। আমার শক্তির ওপরে এ আর-এক বোঝা। লিকটাকে বন্ধ রাখা বা ঘন ঘন ফুঁ দেওযা, এ দুয়ের মধ্যে আমায় বেছে নিতে হবে। আমি এমন ভাবে 'লিক' পুরোপুরি বন্ধ করতে পারব না, কেবল ফু দেওয়ার মাঝের সময়টা বাড়াতে পারি।

আমার একবার দীক্ষিতের কাছে প্রস্তাব করতে ইচ্ছে হয়েছিল আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত লক্ষ্য বদল করে বিপরীত দিকে বড়ো পাহাড়ঘেরা দ্বীপের পানে যাওয়া যাক। (পরে আমি জেনেছি, দীক্ষিতের মনেও সে ইচ্ছের উদয় হয়েছিল।) কিন্তু যদি কিছুটা এগিয়ে থাকি, সেই দূরত্বটুকু খোয়াবার মতো সাহস আমাদের ছিল না। আর শীতল প্রবাহ প্রতিটি দ্বীপকেই ঘিরে থাকতে পারে। অত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না। এমন তাড়াহুড়োর মধ্যে জ্যাকেটটা পরেছিলাম যে এর স্ট্র্যাপগুলো কোমরে বাঁধার বদলে কোমর থেকে প্রায় চার ইঞ্চি ওপরে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল।

ঢিলে হয়ে ওটা আমার চারিপাশে ভাসছিল, ওপর দিকটা অস্বস্তি সৃষ্টি করছিল আর এর স্ট্র্যাপগুলো পাঁজরের ওপরে চেপে বসেছিল।

দীক্ষিতের কাছে আমি অনবরত অনুযোগ করছিলাম যে লাইফ-জ্যাকেটটায় কিছু গোলযোগ আছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে আমি মাথার চারিপাশে হাত বোলাতে গিয়ে রক্তের চিহ্ন দেখে বুঝলাম মাথা কেটে গেছে। যন্ত্রণা এমন কিছু বেশী হয় নি বলে আমি মনে করলাম আঘাতটা সামান্যই। ডানদিকের পাঁজরের কাছে যেখানে স্ট্র্যাপটা আমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছিল সেখানে একটা বড়ো ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল ; কিন্তু তার কথা আমি ডাম্‌পায়ার জাহাজে নিরাপদে থাকার সময়ে জানতে পেরেছিলাম।

গলা-ঘিরে-রাখা ঢিলে লাইফ-জ্যাকেটখানা চিবুকে আঘাত করছিল আর বাঁধনের জায়গাটা শ্বাস রোধ করে দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। আমাদের এক বিশ্রামের অবসরে, বহু কষ্টে, আমি ওই বাঁধন থেকে গলাটাকে ছাড়িয়ে নিতে পেরেছিলাম। আমি এটাকে খুলে ফেলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমি 'লিক্‌'-করা জায়গাটাকে পাকিয়ে রেখে হাতটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। শ্রমনিরত শরীরে বিশ্রামই একমাত্র ইন্ধন। যখন তখন, সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে আবার ইন্ধন জোগাড় করে নিতে হচ্ছিল। অবশ্য এ অত্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থাও বটে। আমাদের একমাত্র রণকৌশল যুদ্ধ আর বিশ্রাম, আর আবার যুদ্ধ করা যতক্ষণ না অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিরামের জন্য বাধ্য করে।

কী আশ্চর্য, কত সহজে যে কোনো রুটিনে একঘেয়েমি এসে যায় : এমনকি জীবন-মরণ যুদ্ধতেও। মাঝে মাঝে কথা বলা ছাড়া আমাদের বাঁধা-ধরা রুটিন ছিল, সাঁতার কাটো আর বিশ্রাম নাও, বিশ্রাম নাও আর সাঁতার কাটো।' এমনই এক বিশ্রামের সময়ে

দীক্ষিতের এক প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম, "কারনিক, তুমি গান গাইতে জান ?"

"কী বললে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'গাইতে পার কি, না ?'

"হায় ভগবান! না- ' আমি জবাব দিই, 'আমার বাথরুমে 'শাওয়ার'এর নিচে ছাড়া পারি না।"

'বেশ, তাহলে,' তিনি বললেন, "মনে করে নাও, তুমি এখন একটা শাওয়ারের নিচে আছে -আর গান ধরো। যা হয় গাও। আজন্মকালের মারাত্মক একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচাও, অন্যথায় যে কোনো মুহূর্তে আমি এই রণে ভঙ্গ দিয়ে নিদ্রা দিতে পারি—সম্ভবত চিরনিদ্রা..."

ওর বক্তব্য আমি বুঝতে পারি। কয়েক বছর আগে যুদ্ধক্ষেত্রের এক মার্কিন সংবাদদাতার লেখা এক ঘটনার বিবরণী পড়েছিলাম। তিনি রাশিয়াতে লালফৌজের এক বিমানে সোবিয়েত পররাষ্ট্র-সচিব ভিসিন্‌স্কির সঙ্গে যাচ্ছিলেন। তাপমান শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে আর বিমানের প্রত্যেকেই শীতে জমে মরণাপন্ন। এমন সময়ে ভিসিন্‌স্কির মাথায় এক বুদ্ধি এল। তিনি মার্কিন সংবাদদাতাকে তাঁর সঙ্গে বক্‌সিং ম্যাচ খেলার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন, যাতে শরীর গরম থাকে আর রক্ত-চলাচল অব্যাহত থাকতে পারে। বিমান তুষার-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলল। সংবাদদাতার মতে, আকাশে সেই ঘুষোঘুষি তাঁর জীবন, বলতে গেলে বিমানের প্রত্যেকেরই জীবন, রক্ষা করেছিল, কারণ তাঁরাও তাঁদের দেখাদেখি মহাজনপন্থা অনুসরণ করে পরস্পর মারপিট শুরু করেছিলেন।

"বেশ," আমি মনে মনে বললাম, "যদি জরুরী অবস্থায় একজন মাননীয় পররাষ্ট্র-সচিব একজন সংবাদদাতার সঙ্গে বক্সিং লড়তে পারেন, তাহলে এমত অবস্থায়, আমিও গাইতে পারি।"

অতঃপর দক্ষিণ চীন সাগর আমার বেসুরো গলার গানে ভরে উঠেছিল।

আজও আমি স ঠিকজানি না, আমার প্রেরণায়, না বেসুরো গলার চিৎকারজনিত বিরক্তিতে, মন্ত্র ফলপ্রসূ হল। কিন্তু একথা নিশ্চিত আমার গান শেষ হতে না হতেই দীক্ষিত নতুন উদ্যমে আবার সাঁতার কাটতে শুরু করে দিলেন।

যে টুকরো টুকরো মেঘগুলি এতক্ষণ পূর্বদিগন্তে ছিল তারা ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছে আর যদিও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তবু তারা সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। এমন চলমান মেঘে পাহাড়ের মাথাও ঢাকা পড়ে গেছে। মাঝে মাঝে বৃহস্পতি, সহচর-সমাবৃত হয়ে মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়ে আমাদের পথ-বিচ্যুতির সাবধান-বাণী শুনিয়ে যাচ্ছে। কখনো সখনো তাঁর দর্শন পেলেও তারই জন্যে সঠিক পথে যাবার সাহায্য হচ্ছিল। এই ছোট মেঘেরাই পুবকোণে এক বিশাল সমাবেশ জমিয়ে তুলেছিল। যেন রাতের শেষে পুব আকাশে জনসভা হবার কথা আছে আর তাই দলে দলে মেঘেরা অবিরল ধারায় পশ্চিম থেকে পুবের দিকে ধেয়ে আসছে। আকাশে আর-এক 'বান্দুং কনফারেন্স' আমার মনে হল, আর ভাবলাম আকাশেও কি স্যাবোটাজের ষড়যন্ত্র চলেছে।

পূর্ব আকাশের এই মেঘের সমাবেশ ক্রমে সারা আকাশ জুড়ে ধোঁয়াটে কালো ছাপ দিয়ে গেল। দীক্ষিত আবার ঘড়ির দিকে চাইলেন। পরম অনুগত ভৃত্যের মতো কালক্ষয় লিপিবদ্ধ করে চলেছে সে। চাঁদ ওঠার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। চাঁদ থাকবে মেঘের অস্বচ্ছ পর্দায় ঢাকা। শুধু চাঁদই নয়, বৃহস্পতিও ঢাকা পড়বে। হয়তো আর তার দেখা পাব না। নিয়তিকে নিষ্ঠুর আর কঠিন মনে হল। গ্রহ বা পাহাড় দেখে পথ নির্ণয় করার যে স্বল্প সম্ভাবনা ছিল তাও আমাদের কাছ থেকে সে ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে ক্রমে হতাশা জমে উঠতে থাকে।

যে উনিশ জন দুপুরে হংকং ত্যাগ করেছেন, তাঁদের ভাগ্য কোন গ্রহের নিয়ন্ত্রণাধীন—কে জানে, আমি ভাবলাম। আটজন চীনা প্রতিনিধি, একজন পোলিশ, একজন অস্ট্রিয়ান সংবাদদাতার একজন

ভিয়েৎমীন কর্মী ও আটজন বিমান-কর্মী। চোদ্দজন ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন। বাকি পাঁচ জন সমুদ্রের বুকে যুঝে চলেছেন, সদাশঙ্কিত যে তাদের জন্যে সলিল সমাধি আয়োজিত হয়ে আছে।

যখন এমনি ভাবে আমাদের প্রাণ মহাসাগরে মৃত্যুর আশঙ্কায় একটি সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছিল, দীক্ষিত চিৎকার করে উঠলেন, "ওই আলোটার দিকে তাকিয়ে ছাখো। 'মোর্‌স্' (টেলিগ্রাফের ভাষা) পাঠানো হচ্ছে। আলো দিয়ে মোর্‌স্ পাঠাচ্ছে।" আমাদের পশ্চিমে অতি ক্ষীণ একটি টর্চের আলো জ্বলছিল। মোর্‌স্ কিনা বোঝার জন্য আমি অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম। দীক্ষিত চিৎকার করেই বললেন— এ তো মোর্‌স্। কেবল জাতারই মোর্‌স্ পাঠাতে পারেন। এ নিশ্চিত জাতার। ঢেউয়ের জন্যে আমি সঙ্কেতের ভাষাটা পড়তে পারছি না।"

আমাদের বিমানে মাত্র তিনজন মোর্‌স্ জানতেন —জাতার, দীক্ষিত আর পাঠক। তাই দীক্ষিত নিশ্চিত হলেন যে ওদিকে জাতার। আমার মনে হল ঢেউএর জন্যে কোনো স্থির আলোকেই এমন দেখাচ্ছে— তা ছাড়া আর কিছু নয়। ঢেউএর বাধায় মোর্‌স্ সঙ্কেত পড়া যাচ্ছে না, তা নয়। ঢেউএর জন্যেই কোনো স্থির আলোকবিন্দুকেই এমন দেখাচ্ছে। আমি জানতাম, জাতারের প্রতি দীক্ষিতের গভীর অনুরাগের জন্যেই এগুলো ওঁর চোখে মোর্‌স্ বলে বোধ হচ্ছে। আর মোর্‌স্ অর্থেই জাতার। ঢেউএর চূড়ার মাঝে মাঝে আমরা পুরো এক বা দু মিনিট ধরে ওই আলোটিকে দেখলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, আমাদের ডান দিকে, উত্তর কোনায় আর একটি ক্ষীণ স্থির টর্চের আলো নজরে পড়ে এই লোকটি স্পষ্টত গ্রেট নাতুনার তীরের অতি নিকটে। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে ওই লোকটি অনতিবিলম্বে দ্বীপে পৌঁছাবে। আমাদের মনে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস জেগে উঠল : শেষের যে দুজন লোক ভেসে ওঠার পর থেকে এতক্ষণ খবরই জানতাম না, বেঁচে আছে। আশা আর প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন আমরা সকলে শিগগির দ্বীপে পৌঁছে যাই। যেন

আমাদের প্রার্থনার উত্তরে আমাদের প্রায় ২০০ গজ দূরে দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত জোরালো একটি টর্চকে জ্বলে উঠতে দেখলাম। ক্ষণেক পরেই, একটি ছোট সার্চলাইট বা খুব জোরালো একটি টর্চ তার ঠিক পাশেই জ্বলে উঠে আমাদের দিকে তার রশ্মি ছড়িয়ে দিল।

অসীম নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে এত উজ্জ্বল আলোয় এক মুহূর্তের জন্যে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এই আলোতে, দীক্ষিত আর আমার, দুজনের দু রকম প্রতিক্রিয়া হল। আমরা দুজনেই জানতাম যে এই প্রখর আলো কোনো ভাসমান লোকের কাছ থেকে আসে নি। অবিসংবাদিতভাবেই এর উৎস অন্য। দীক্ষিত নিশ্চিত ছিল যে সমীপবর্তী দ্বীপ থেকে কেউ আমাদের উদ্ধারের জন্য এসেছে। হয়তো বা পাঠক গ্রেট নাতুনায় উপস্থিত হয়ে জেলেদের সাহায্য লাভ করেছে। অন্তর্ঘাতী কার্যকালাপের চক্রান্তকারীরা তাদের পাপ-কর্মের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কত নৃশংস হয়, সে সম্পর্কে বহু কাহিনী শুনেছি। আমার মনে এক আতঙ্ক ছিল যে এ নিশ্চিত একটি সার্চলাইট আর মেশিনগান সজ্জিত তাদেরই একখানি নৌকা,—যাদের অনুচরেরা বিমানে বোমাটি রেখেছিল। বিমানটি জ্বলে ছিন্নভিন্ন হয়ে তলিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে নরঘাতক হাঙরদের কবলে না পড়ে থাকে, তাহলে প্রাণরক্ষা-পাওয়া অবশিষ্ট মানুষগুলোই পাপকর্মের সম্ভাব্য সাক্ষ্যসূত্র। এ-সব কল্পনা অহেতুক আতঙ্কপ্রসূত হতে পারে। দীক্ষিতের যুক্তি অধিকতর সম্ভব, বোধহয়। তিনি তাঁর বাঁ হাত উঁচু করে নাড়লেন আর আমাকেও নাড়াতে বললেন। এক মুহূর্তের জন্যে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হলাম, তারপর আমার ডান হাত উঁচু করে নাড়ালাম। শুধু লাইফ-জ্যাকেটের ছোট্ট আলোয় আমাদের হাত নাড়া দেখতে পাওয়া ওদের পক্ষে খুব বেশী সম্ভব ছিল না। তবু, তখন আমরা যেন নিশ্চিত হলাম যে আমাদের আলো তাদের অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তবে তারা আমাদের উদ্ধারের জন্যে এল না কেন? ভাসমান শবদেহ মনে করে কি আমরা পরিত্যক্ত হয়েছিলাম? কখনই

আর তা জানতে পারব না আমরা। আলোগুলি আর দেখা দিল না।

হয়তো আলোকধারী ঐ লোকেরা আকাশে সঞ্চরমাণ ঘনঘটা দেখে সরে পড়েছে। এমন সময় উদ্ধারের কাজে থাকলে নৌকার আরোহীদের জীবন বিপন্ন করা হবে। যে কজনকে বাঁচানো যাবে তার চেয়ে অধিক-সংখ্যকের জলে ডুবে প্রাণ হারানোর আশঙ্কা। হতভাগ্য ওই ভাসমান লোকগুলোর সঙ্গে ত্রাণকর্তারাও নিশ্চিহ্ন হতে পারে। বুদ্ধিমানের মতো, তারা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করেছে।

বিদ্যুৎ-চমকে আর মেঘের গর্জনে আকাশের ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। কোথা থেকে বিশাল কৃষ্ণ মেঘ জেগে উঠে সহসা আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। এতক্ষণে অনুভব করলাম আমরা এক অতল-স্পর্শী গহ্বরে ডুবে গেছি। বিশ্বলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন, ওই তারা, ওই পাহাড়গুলো, ওই দ্বীপ সব কিছু হারিয়ে গেছে, শুধু পরস্পরের কাছে পরস্পর আছি, আর আছে কশাঘাত নিয়ে ক্ষুব্ধ ঢেউ। এমন কি দীক্ষিতের লাইফ-জ্যাকেটের আলোটিও আমাদের ত্যাগ করে গেল, ভয়াবহ তমসাকে আরো নিবিড় করে রেখে। ঝড় সগর্জনে ঢেউগুলোকে আরো উত্তাল করে তুলল। আমরা এক ঢেউ থেকে আর এক ঢেউএ ছিটকে পড়ছিলাম। সাঁতার কাটা বন্ধ করে দিয়েছি। তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অশান্ত সমুদ্রে সাঁতার কাটা নিরর্থক! ঢেউগুলো প্রতি নিমেষে আমাদের এপাশ থেকে ওপাশে নিয়ে যাচ্ছিল, উঁচুতে তুলে ধরে পরক্ষণেই ফেলে দিচ্ছিল। এই ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া ঢেউ আমাদের ভয়াবহ খোলা সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে পারে, আশঙ্কা হচ্ছিল। খোলা সমুদ্রে একবার গিয়ে পড়লে, প্রাণের আশা আর এক কণাও থাকবে না। আরো বড়ো ঢেউ আর আরো বৃহৎ জলচর। কোনো দ্বীপ নিকটে নেই। সকাল পর্যন্ত জীবিত থাকলেও, অনুসন্ধানী দল বিমান বিধ্বংসের জায়গা থেকে এত দূরে যাওয়ার কথা কল্পনাও করবে না।

দানবীয় মেঘের মুখ থেকে এক ঝলক বিদ্যুৎ জ্বলে উঠে ভীষণ অন্ধপরিমণ্ডলকে নিমেষমাত্রের জন্যে আলোকিত করে দেয়। পরি-পার্শ্বস্থ দ্বীপপুঞ্জ একবার চোখে পড়ে, আর ক্রমবর্ধমান শঙ্কা ক্ষণেক প্রশমিত হয়, আমরা এখনো দ্বীপপুঞ্জের মাঝেই আছি। জীবনের আশা তখনো আছে। সবেগে শীতল বাতাস বইছিল। জলও আরো খানিক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি আমার বাঁ হাতে দীক্ষিতকে জড়িয়ে আর দীক্ষিত তার ডান হাত আমার পিঠে রেখে দুজনে দুজনকে কাছে টেনে রাখলাম। পরস্পরের অঙ্গ যেখানে স্পর্শ করেছিল সেখানের তাপ অবারিত অংশগুলির চেয়ে বেশী ছিল। আমাদের দেহের উত্তাপ যথাসম্ভব সঞ্চিত রাখতে হবে, ঝড় থামলে যদি দ্বীপ দৃষ্টিগোচর থাকে তাহলে যাতে আবার চেষ্টা করতে পারি।

বজ্র-বিদ্যুতের পালা শেষ হল। আতঙ্কভরা অন্ধকার রাত দিগবিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সচরাচর ঘন অন্ধকার রাত্রিতেও পাহাড় বা দূরের কোনো জিনিসের অস্তিত্ব অল্পই সীমারেখায় আন্দাজ করা যায়। কিন্তু তখন কোথাও নজর চলছিল না। পাহাড়ের সীমা নয়, দ্বীপের চিহ্নমাত্রও নয়। কেবল অনুভব করতে পারছিলাম, পাশে ভেঙে-পড়া নির্দয় ঢেউএর ঝাপটা যা আমাদের চোখে জ্বালা ধরাচ্ছিল। বড়ো ঢেউএর জল সজোরে মুখের মধ্যে চলে যাচ্ছিল। তাকে বার করে ফেলছিলাম। এক-এক সময়ে জল ফেলে দিতে মুখ খোলামাত্র এত শক্ত এক ঢেউ আছড়ে পড়ছিল যে সারা মুখ ছেয়ে ফেলছিল। জল ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে আরো লবণাক্ত জল উদরস্থ করতে হচ্ছিল। প্রার্থনা করছিলাম, এই বিশ্রী ঝড় অবিলম্বে কমে যাক, না হলে ভাসতে থাকলেও প্রকৃত পক্ষে জলে ডুবেই প্রাণ হারাব (অত্যধিক পরিমাণে লবণাক্ত জল পান করার ফলে)।

ঝঞ্ঝা অব্যাহত রইল। ভগবান জানেন, কোথা থেকে কোথায় আমাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল ; সম্ভবত দ্বীপের থেকে বহুদূরে, সমুদ্রে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের করার কিছু ছিল না, শুধু ভেসে

থাকা ছাড়া। আমাদের গলায় জড়ানো ছোট লাইফ-জ্যাকেট আঁকড়ে ধরে রইলাম। জীবন তখন এই দুটি হলুদ রঙের প্রাণ-ত্রাতার কাছে নির্ভরশীল ; বাতাস দুটি থেকেই ক্রমাগত 'লিক্' করে যাচ্ছে। আমার নেক-টাই তখনো সেই 'লিকের' জায়গায় জড়ানো। ডান তালুতে চেপে ধরে 'লিক' কমাবার চেষ্টা করি।

কিছুক্ষণ পরে পরে জ্যাকেটের ভেতরে বাতাসের চাপ আন্দাজ করার চেষ্টা করি। নরম হয়ে আসছিল জ্যাকেটটা। 'লিক' কম করতে পারি কিন্তু বন্ধ করার উপায় নেই। আমার জ্যাকেটটি নরম হয়ে আসছে, সম্ভবত দীক্ষিতেরটিরও নিশ্চয়ই সেই অবস্থা। জ্যাকেট ক্রমশ নরম হয়ে আসতে থাকে, ক্রমশ প্রাণদাতা বাতাস ক্ষয় হয়ে চলেছে ; আর কতক্ষণ এরা আর আমাদের রক্ষা করতে পারবে? ঝঞ্ঝার বিক্ষোভ প্রশমিত হবার লক্ষণ নেই। আর যতক্ষণ ঝড় চলতে থাকবে জ্যাকেটে আরো বাতাস ভরে দেবার চেষ্টাও করতে পারি না আমরা। বিপদের আশঙ্কা তাতে অত্যন্ত বেশী। তেমন চেষ্টা করতে গেলে, সম্ভবত, বেশ খানিকটা বাতাস লিক্ করে যাবে। ফাঁপিয়ে নেবার টিউবে চাপ দেওয়া মাত্র ওর মুখের মধ্যে জল ঢুকে যেতে পারে, আর তার ফলস্বরূপ আরো কিছু বাতাস বার হয়ে যাবে। এ অতি বিপজ্জনক কাজ ; চরম অবস্থায় চেষ্টা করা যেতে পারে। সাধ্যমত চেষ্টা করে ডোবা অবশ্যই বিনা প্রচেষ্টায় ডোবার চেয়ে ভালো।

বজ্র-বিদ্যুৎ থেমে গেলে, বৃষ্টি এল। ভারী জলের ফোঁটা সজোরে মুখের ওপর আর বাতাস-ভরা লাইফ-জ্যাকেট আঘাত করতে লাগল। চোখ বন্ধ করে এই আক্রমণ ধৈর্যসহকারে সহ্য করি। বৃষ্টির জন্যে যে অসুবিধে আমাদের ভোগ করতে হচ্ছিল, তা সত্ত্বেও একটা সুখকর চিন্তা আমাদের মনে চমক দিয়ে গেল। খানিক পান করার মতো জল আমরা পেতে পারি, কয়েক ফোঁটা নির্মল জল শুকনো গলায় প্রভূত সঞ্জীবনী দান করবে, আরো বহুক্ষণ আরো অনেক উদ্যম নিয়ে নতুন করে প্রাণ রক্ষার জন্যে যুঝতে অনুপ্রাণিত

করবে। আশান্বিত হয়ে মুখ খুললাম আর মুখের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল একটা ঢেউ ; আমার প্রায় শ্বাসরোধ করে দিল। যতখানি পারা গেল, লোনা জল মুখ থেকে ফেলে দিয়ে এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণটা সামলে নিলাম। সাবধানতার সঙ্গে আরো দুবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা নিষ্ফল হল। ঠোঁটের ওপর যে কয়েক ফোঁটা পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল, সেগুলোকেই লোভীর মতো জিভ দিয়ে চেটে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লোনা জলের ছিটে লেগে সেগুলোও বিস্বাদ হয়ে গেছে। আশাহত হয়ে আমরা চোখ, মুখ আর ভাবনা বৃষ্টির থেকে ফিরিয়ে রাখলাম। নরখাদকেরা শিকারকে ঘিরে যেমন সোল্লাসে চিৎকার করে, বৃষ্টি আমাদের জ্যাকেটের ওপর আঘাত করে তেমনি তার নৃশংস উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল ; যেন দুরন্ত মৃত্যুর মৃদঙ্গ বাজিয়ে চলেছে তরঙ্গে নৃত্যছন্দে তাল মিলিয়ে।

ঢেউ আমাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, আমরা জানি নি। নিরন্ধ্র অন্ধকারে দৃষ্টি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকায় কার্যকরী কিছু করার ছিল না। চোখ বন্ধ রেখে একেবারে আত্মসমর্পণ করে রইলাম। কেবল আশা করে রইলাম যে ঝড় শীঘ্রই থামবে। সেই সময়ে স্পষ্ট অনুভব করলাম যে আমরা বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছি। হায় ভগবান, বুকের ওপর ভয় চেপে বসল। ঘূর্ণী! অবধারিত সলিল-সমাধি এর পরিণাম, আমি ভাবলাম। দীক্ষিতকে জানাতে দ্বিধা বোধ করছিলাম। ঠিক তখনি তিনি নিজেই আমাকে বললেন, 'কারনিক, বোধহয় আমরা চক্রাকারে ঘুরছি। তোমার কি তা মনে হচ্ছে না?'

আমি স্বীকৃতি-সূচক উত্তর দিলাম। অনুমোদন লাভ করে আমি উন্মত্তের মতো ডান পা ছুঁড়তে শুরু করি, ঘূর্ণীর বাইরে আসার জন্যে। আমরা ঘূর্ণীর প্রায় সীমান্তেই ছিলাম। সুতরাং আমরা নিজেদের সরিয়ে আনতে সক্ষম হলাম। যে মুহূর্তে আবার অঙ্গচালনা স্থগিত রাখলাম তখনি আবার সেই স্রোতের আবর্তনে গিয়ে পড়লাম। দীক্ষিত আমার সহসা অপ্রত্যাশিত ব্যগ্রতায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল আর ঘূর্ণীর বাইরে

আসার আবার চেষ্টা শুরু করতেই আশ্বাস দিল, সমুদ্রের এই ঘূর্ণী মোটেই বিপজ্জনক নয়। আত্মস্থ হয়ে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়ে রইলাম, এমনকি খুশীও হয়েছিলাম যে আমরা ঘূর্ণীতে পড়েছি। অন্তত পক্ষে আমরা এক বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ থাকব, অর্থাৎ অতল সমুদ্রে ভেসে গিয়ে পড়ার হাত থেকে রেহাই পাব।

নিশ্চিন্ত, নিষ্কর্মা হয়ে এমনকি শিথিল শরীর মেলে বিশ্রাম নিতে নিতে ভাসতে লাগলাম; স্রোত আমাদের চক্রাকারে ঘুরিয়ে চলল। কখন এই ঘূর্ণীর বাইরে এসে পড়েছি, তাও বুঝতে পারি নি। ঝড় থেমে গেছে। ঢেউয়ের তুলুনি হ্রাস পেয়েছে। ঘুমের ঘোরে আমি প্রায় অর্ধচেতন; দীক্ষিত উত্তেজিত স্বরে আমায় ডেকে তুললেন, "ডান দিকে ছাখো। ওটা কী?" চোখ মেলে সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ দেখলাম। আকাশের বুকে উজ্জ্বল চাঁদ ঝলমল করছে। জলে প্রতিবিম্বিত রজতরশ্মি।

সানন্দে ছোট ছোট ঢেউ নাচছে। ঝড়ের রেশমাত্র আর ছিল না। স্বচ্ছ পাতলা মেঘের আস্তরণ এখানে ওখানে। আর আমাদের দক্ষিণে জেগে রয়েছে প্রাণের এক নতুন আশা, ঘন নারকেল বনে ঢাকা ছোট একটি দ্বীপ। আনন্দের এক জোয়ারে বুক ভরে উঠল। গ্রেট নাতুনা বা সামনের পাহাড়, যেখানে আমরা ঝড়ের আগে চার ঘণ্টা নিষ্ফল সংগ্রামে অতিবাহিত করেছি, তার দেখা নেই। ঝড় পাঠিয়েছিলেন বলে ভগবানকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। সম্ভাবনা-ভরা নতুন পরিবেশে সে আমাদের এনে দিয়েছে, আর একঘণ্টার অধিককাল বিশ্রামের অবকাশ দিয়েছিল আমাদের অবশপ্রায় অঙ্গকে। পাঠক আর অন্যদের প্রত্যাশায় ফিরে দেখলাম। জনপ্রাণীর চিহ্ন চোখে পড়ে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে পাঠক গ্রেট নাতুনায় পৌঁছে গেছেন আর অন্যেরা সম্ভবত অন্য কোনো দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছেন।

আমাদের লাইফ-জ্যাকেট এত নরম হয়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেকটি থেকে প্রায় অর্ধেকের বেশী বাতাস 'লিক' করে গেছে। ভাসিয়ে

রাখার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হই। দীর্ঘ বিশ্রামের 'পর আবার আমরা সতেজ সবল হয়ে উঠি। জ্যাকেটে ফুঁ দিয়ে তাদের ফুলিয়ে নিই, যাতে বেশ কিছুক্ষণ আর বাতাস ভরতে না হয়। নারিকেল-বেষ্টিত ছোট দ্বীপটিতে পেঁ ৗছবার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আবার আমরা পুরোনো রুটিনপথ পরিক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলাম। এক, দুই, তিন—যাত্রা শুরু করলাম। দ্বীপটির দূরত্ব আধ মাইলের বেশী হতে পারে না। মনে নতুন আশা আর দেহে নতুন বল পেয়ে আমরা সোৎসাহে অবিলম্বে দ্বীপে পেঁ ৗছবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা ক্রমাগত চেষ্টার পর, ফিরে দেখে নেবার জন্যে থামলাম। নিদারুণ বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে শিউরে উঠলাম। গ্রেট নাতুনা পেঁ ৗছবার প্রয়াসের এ এক পুনরভিনয়। আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেকটি দ্বীপ মারাত্মক শীতল প্রবাহে বেষ্টিত। গত আধঘণ্টা আমরা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হই নি। আমরা চিন্তা করলাম, নিজেদের আর এমন ক্ষয় করার অর্থ হয় কি? বরং আমরা সকাল পর্যন্ত ভেসে থাকি, তখন কেউ আমাদের জল থেকে উদ্ধার করতে পারবে। বেশী চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। রুদ্ধশ্বাসে দেখলাম, আমাদের সামনে, প্রবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকে যার আশঙ্কা করে আসছিলাম--সেই সুবিশাল উন্মুক্ত সমুদ্র। দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মুখবিবর বিস্তার করে সেই ভয়ালদর্শন আমাদের গ্রাস করার জন্যে অপেক্ষা করছে। দিশাহারা হয়ে এক আশ্রয়ের সন্ধানে আমরা চারিধারে ফিরে তাকালাম। সানন্দে দেখি, একটি নতুন দ্বীপ আমাদের পেছনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কী ঘটেছে, নিমেষে বোধগম্য হল। শীতল জল-প্রবাহে আমরা খোলা সমুদ্রের দিকে ভেসে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক পেছনেই পড়েছে ছোট এই দ্বীপটি।

এই হল মুক্তির অন্তিম সহায়; বিফল হলে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর খোলা জায়গায় পড়ে থাকায় মৃত্যু সুনিশ্চিত। তা ছাড়া বিমান ধ্বংস হওয়ার জায়গা থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি, এখানে অনুসন্ধানী

দল আমাদের জন্যে আসবে না। দৃঢ়সংকল্প হয়ে উৎসাহের উত্তেজনায় এত বেগে হাত-পা এর পর চালনা করলাম যে এই প্রথম সন্তোষজনক ভাবে আমাদের পরিশ্রম পুরস্কৃত হল। ফললাভে অনুপ্রাণিত হয়ে গতি আরো দ্রুত করলাম। দ্বীপের একটি ছোট পাহাড় মাথা তুলল। বেলাভূমির বালুকণা চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হল। আর একশো গজ অতিক্রম করে গেলেই স্থায়ী নিরাপত্তা লাভ করতে পারব।

সামর্থ্যের সম্পর্কে মনে অতি উচ্চাশা পোষণ করেছিলাম। সাড়ে সাত ঘণ্টা জীবন-মরণ সংগ্রামের পর নিজেদের কাছে অত্যধিক প্রত্যাশা করা সমীচীন হয় নি। এত তাড়াহুড়োর অবশ্যম্ভাবী ফল হল এই যে একেবারে দম ফুরিয়ে গেল, আর এমন শ্রান্তি অধিকার করল শরীরকে যে একটা আঘাত দেবার মতো শক্তিও আর হাতের রইল না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম প্রয়োজন। যাই হোক, আমরা দ্বীপটির সমীপবর্তী হয়েছি, মাত্র আর একশো গজ বাকী। তাড়াহুড়ো করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা সক্ষম হয়েছি। ক্ষণেকের জন্যে চোখ বুজলাম, আনন্দের আতিশয্যে নয়, শক্তিসঞ্চয়ের জন্যে। আমাদের জানা ছিল যে শুধু স্রোতই নয়, ভাঁটার টানও আমাদের দ্বীপের তীর থেকে সরিয়ে রেখেছে।

তখন আমাদের মনে হল, এই অবশেষটুকুর মতো দম আমাদের আছে। দূরত্ব আন্দাজ করে নিই। এ দ্বীপে পৌঁছবার চেষ্টা আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। এ আর আমাদের নিরাশ করতে পারবে না। আমরা বুঝলাম, শেষটুকুর জন্যে এত তাড়াহুড়ো না করলে এতক্ষণে আমরা তীরে পৌঁছে যেতাম। সেই সঙ্গে শক্তি-সামর্থ্যের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে— সে সম্পর্কেও সচেতন ছিলাম। অনন্তকাল এ শক্তি থাকতে পারে না। যাই হোক, যতক্ষণ পারি এর যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমরা স্থির করে নিলাম, এই শেষ চেষ্টার মাঝে আর কথা বলা কিংবা থামা নয়। প্রত্যেকটি শ্বাস সাঁতারের জন্যে নিয়োজিত হবে। মাটিতে পা ঠেকলে কিংবা একেবারে শ্রান্ত হয়ে গেলেই আমরা

থামব, অন্যথায় নয়। আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাস্বরূপ হাত আর পা এক নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে নেড়ে চললাম, বেশী মন্থর নয়—বেশী বেগেও নয়।

সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে দম-দেওয়া পুতুলের মতো আমরা এগিয়ে চললাম। সমাগতপ্রায় দ্বীপের পানে পেছন ফিরে তাকাবার জন্যে প্রলোভনও আমাদের হল না। একবার দাঁড়ানোর মতো ঝুঁকিও আমরা নিতে চাই না। সবে যাওয়া সম্পর্কেও আর বিশেষ দুশ্চিন্তা আমাদের ছিল না। মুখের সামনে চাঁদকে দিক্‌দর্শক হিসেবে আমরা ব্যবহার করছিলাম। আমরা জানতাম, যে বেশ খানিকটা ভেসে সরে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু তার ফলে দ্বীপের মাঝখানে না পৌঁছে বড়ো জোর ধার ঘেঁষে গিয়ে উঠব। দ্বীপের ধারে কাছে না পৌঁছতে পারার চেয়ে বরং পাশ ঘেঁষে ওঠাও ভালো। কতক্ষণ সাঁতার কেটেছি জানি না, সম্ভবত আরো আধঘণ্টা সাঁতার দিতে হবে। আমরা নিয়মিত ভাবেই এগিয়ে চললাম।

সহসা আমার ডানহাতখানা কঠিন কী যেন স্পর্শ করল। তৎক্ষণাৎ আমি তাকে সজোরে ধরি। পাথর ছাড়া কিছু নয়। পাথর থেকে হাত না সরিয়ে আনন্দে আমি চিৎকার করে উঠি, "দীক্ষিত, হয়েছে··· এই যে একখানা পাথর···।" মুহূর্তখানেক দীক্ষিত বিশ্বাস করে উঠতে পারেন নি। পাথরটি আমার ডানদিকে, তাই আমি যতক্ষণ এর পর উঠে জায়গা না করে দিই, ততক্ষণ তাঁর পক্ষে কাছে আসা সম্ভব নয়। "কোথায়, কোথায় ?" তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করে চললেন। আমি পাথরের ওপরে উঠে দীক্ষিতকে টেনে নিলাম। কী যে স্বস্তি পেল শ্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কঠিন পাথর আমাদের পায়ের নিচে। ক্লান্তিতে গভীর শ্বাস নিতে নিতে আমরা পরস্পরের দিকে হাসিমুখে তাকালাম।

প্রায় সমস্বরে দুজনে বলি উঠি, "আমরা বেঁচে রইলাম।" পরিবারের সকলের কাছে ফিরে যাবার জন্যে বেঁচে রইলাম। প্রায় মনেই পড়ে নি যে ঘরে সকলে সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে ; জানে না, আমরা

ফিরব কি না। আশার অতীত প্রত্যাশা তাদের হয়তো! প্রার্থনা করছে, যেন ঘরে ফিরি আমরা। কী সৌভাগ্য আমাদের।

দীক্ষিত প্রস্তাব করলেন যে অবিলম্বে আমাদের তীরে পেঁছিনো উচিত। যেখানে ছিলাম, সেখানে থাকতেই আমি তৃপ্ত। আমি বললাম, "বাকী রাতটা পাথরের উপরেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।" তিনি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন; অপূর্ব যন্ত্রখানা। ন ঘণ্টা লোনা জলে থেকেও অবিকল চলেছে। স্থানীয় সময় তখন রাত একটা তিরিশ। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেন, এখন ভাঁটার সময়। সকালের মধ্যে পাথরখানা জোয়ারে তলিয়ে যাবে। আমি অনুরোধ করলাম, অন্তত আধঘণ্টা-খানেক পাথরের ওপরে বিশ্রাম করা যাক। দীক্ষিত সানন্দে সম্মতি দিলেন। দূর থেকে মনে হয়েছিল যে তটদেশ পর্যন্ত বেশ জল আছে। ভাগ্যক্রমে, যাই হোক, শেষের প্রায় একশো গজ পাথরে ভরা। গভীর জল হলে, খুব সন্দেহজনক যে আমরা আর বেশী সাঁতার দিতে পারতাম কিনা, তখন এমন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

মিনিট পনেরো পরে আমরা ঝিকমিক-করা সোনালী বেলাভূমির পানে যাত্রা করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিলাম। এতক্ষণে আমাদের দুজনকে বিশ্বস্তভাবে একত্র রাখার ওই স্ট্র্যাপের বাঁধনটা খুলে দিলাম। ফাঁস খোলার সময় দীক্ষিত বললেন, "এবার আমরা যমজ হলাম, কারনিক।"

"হ্যাঁ, তা বইকি।" আমি বললাম, "প্রতি বছর ১২ই এপ্রিল আমরা আমাদের জন্মদিন হিসেবে পালন করব।"

আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু দেখলাম পা দুটো শরীরের ওজন বইতে পারছে না। বিশেষত পাথুরে জমি হওয়ার জন্যে। দীক্ষিতও কোনো সাহায্য না নিয়ে হাঁটতে পারছিলেন না। পাথর-গুলি পিছল সবুজ ভেল্‌ভেটের মতো উদ্ভিদে ঢাকা। তার ওপরে প্রায় একফুট স্বচ্ছ জলের আস্তরণ। চাঁদের আলো তার ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। এরই সুযোগে আমি হাতে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে যেতে

পারছিলাম। ওই পিছল শেওলা দীক্ষিতের ভালো লাগছিল না। তিনি বললেন, জ্যান্ত মাছ হাতের মুঠোয় ধরার মতো বিশ্রী বোধ হচ্ছে। তিনি তার বাঁ হাত আমার ডান কাঁধের ওপর ভর দিয়ে চলতে শুরু করলেন। আমি একটা পাথরে বসে পরের হাতে ভর দিয়ে অন্যটিতে উপস্থিত হচ্ছিলাম। দু-একবার দীক্ষিত এগিয়ে গিয়ে নিজেকে সামলাতে পারেন নি, আর অতিকষ্টে বাঁ-হাতে ভর দিতে হয়েছে। "ডিকি, যেমন আছ তেমনি থাকো। আমি তোমার কাছে আসছি।" যত তাড়াতাড়ি পারি গুঁড়ি মেরে আমি তাঁর কাছে যাই।

তিনি তখন বললেন, "বোধহয় এখানে কাঁকড়া আছে। কাঁকড়া, ভগবান! হাঙরের চেয়ে আমার কাঁকড়াকে বেশী ভয় করে।"

"জানি, এ বোকামি", আমি বললাম, "কিন্তু ভয় না করে পারি না।" ঠিক তখনি পাথরের সন্ধানে বাঁ পা বাড়িয়ে বাঁ পায়ের আগায় একটা কামড় খেলাম। চিৎকার করলাম, "কাঁকড়াতে আমায় কামড়ে দিয়েছে।" জল থেকে পা তুলে নিলাম। কাঁকড়া হলে সে আঙুলে ঝুলেই থাকত। ওটা একটা কাঁটার ঝোপ। টেনে ছাড়িয়ে ফেললাম। বেশীর ভাগ কাঁটাই ভেঙে গেল। খুব বেশী কাঁটা না ফোটে তার জন্যে আমাদের আরো সাবধান হতে হল। তা সত্ত্বেও, সতর্কতা হিসেবে, পা বাড়াবার আগে, যদি কোনো কাঁকড়া থাকে তাদের তাড়াবার জন্যে হাতে করে জলে ঘা দিতে লাগলাম। এই অতি সতর্কতায় দীক্ষিত কৌতুক বোধ করছিলেন, জ্যোৎস্নার আলোয় তাঁর মুখের চাপা হাসি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

এতক্ষণে আমাদের মনে পড়ল যে লাইফ-জ্যাকেট দুটো ফাঁপানোই রয়েছে; আর চলাফেরায় বেশ অসুবিধের সৃষ্টি করছে। তাই আমরা ওগুলোর বাতাস বার করে দেবার জন্যে দাঁড়ালাম। ভাঁজ করে পিঠে ঝুলিয়ে রাখলাম। চলাফেরা এর পর বেশ সহজ হল। দীক্ষিতের রসবোধ আবার সদাহাস্য মুখে ফুটে উঠল; বললেন, 'এ কি, কারনিক্, তোমার শার্ট যে ভিজে!"

আমি . অবাক হয়ে ফিরে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "তোমারও ভেজে নি ?"

তিনি বললেন, "ভিজেছে বই কি ?"

"তাহলে তুমি বললে কেন যে, আমার জামা ভিজে ?"

"আমি স্রেফ একটা মন্তব্য করছিলাম।"

আমরা আবার নতুন রুটিন অনুসারে পরিক্রমা শুরু করলাম : জলে ঘা দেওয়া, পাথর খুঁজে দেখা, আর তারপর সামনে পা বাড়ানো। প্রায় দু-ঘণ্টা পরে আমরা পাথরের শেষে এসে পেঁছিলাম। হাতে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলার আর প্রয়োজন ছিল না। পায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়াতে পারছিলাম এখন, যদিও যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল, তবু ধীরে ধীরে হাঁটুজল ভেঙে সমতল বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। শুকনো বালির বেলাভূমিতে পেঁছিতে আর কুড়ি গজ হাঁটতে হবে। জলের ওপরে ছোট ছোট ঢেউ আর প্রতিটি ঢেউয়ের মাথা ছুরির ডগার মতো ঝকমক করছিল। সহসা চোখ পড়ল, বিশালকায় একটা কুমিরের মতো জীবের দিকে, দশগজ দূরে নড়াচড়া করছে। আমি দীক্ষিতের হাত সজোরে চেপে ধরে বলি, "দেখো···একটা কুমির···" আমি ভয় পেয়ে ছিলাম, তা সত্ত্বেও ঝুঁকে পড়ে একটা পাথর তুলে নিই। যদি ওটা কুমির হয় তাহলে আক্রমণ করার সময় হা করে তেড়ে আসার কথা। তখন আমি মুখের মধ্যে পাথরটা দিয়ে আঘাত করব, স্থির করি। কুমির সমুদ্রের জলে থাকে না, দীক্ষিতের এই সনির্বন্ধ আশ্বাসের পরই আমি সাহস সঞ্চয় করে পাথরখানা ফেলে দিই আর ওঁর হাত ছাড়ি। হাত ধরে টেনে তিনি আমায় কাল্পনিক কুমিরটার কাছে নিয়ে গেলেন। দেখি, এঁকেবেঁকে-পড়ে-থাকা একটি সামুদ্রিক শেওলা, ঢেউয়ের দোলা তাকে নড়াচড়া করছে মনে হল। ঠিক তখনি কানে গেল একটি বিমানের গুঞ্জন। অনেক উঁচুতে, নির্মেঘ জ্যোৎস্নালোকিত আকাশে একখানি 'ডাকোটা'কে নির্বিবাদে ভেসে যেতে দেখলাম। অচিরে সে অদৃশ্য হল।

নির্জন দ্বীপে ভেসে এসে স্বভাবতই আমাদের ভাবনা অদূর ভবিষ্যতের পানে নিবদ্ধ হল।

"এই দ্বীপে কেউ বাস করে মনে বলে হয় না," দীক্ষিত বললেন।

আমি তাঁর কথায় সম্মতি জানালাম।

"কতদিন আমরা এখানে বাস করতে পারি, তোমার মনে হয়?"

"অনির্দিষ্ট কাল, আমার বিশ্বাস," আমি জানাই।

'পান-আহারের কী হবে?'

'চিন্তার কিছু নেই। দেখো, এতো নারকেল গাছ রয়েছে। নারকেল—ডিনারে, ব্রেকফাস্টে আর লাঞ্চে···আর সেই সঙ্গে জলও অবশ্যই নারকেল থেকে।'

আর তারপর আমার মধ্যে রবিনসন ক্রুশো জেগে উঠল; আমি বললাম, "যদি পক্ষকালের মধ্যে কেউ আমাদের খোঁজে না আসে আমরা একটা নৌকা গড়ে সিঙাপুর অভিমুখে যাত্রা করব।"

দীক্ষিত হাসলেন না। সম্ভবত আমার মতো হালকাভাবে তিনি পরিস্থিতিটাকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাঁর ছেলেরা, স্ত্রী আর বৃদ্ধ বাবা মা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় নিশ্চয়ই মরণাপন্ন। তাঁকে অমন গম্ভীর দেখে আমারও প্রতীক্ষাকুল 'ফিঁয়াসে,' বাবা-মা আর আত্মীয়-স্বজনদের কথা মনে হল। দুজনের মনোবল ফিরে পাবার জন্যে আমি বললাম যে সকালের মধ্যে একটা জেলেদের নৌকা এসে পড়তে বাধ্য। দুজনেই সেই উদ্ধারের সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হলাম।

তখন রাত সাড়ে তিনটে। অনতিবিলম্বে আমরা শুকনো ডাঙায় পৌঁছলাম। জ্যাকেট দুটো খুলে বালির ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আর সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালাম। শান্ত, সহাস, সুহৃদের মতো দেখাচ্ছিল এখন। আমরা দেখতে লাগলাম যে না-জানা সেই দুজন আমাদের পেছনে পেছনে একই দ্বীপে আসার চেষ্টা করছে কিনা। কিন্তু কোথাও কোনো জীবনের লক্ষণ নেই। সামনে বিস্তৃত সমুদ্র আর দূরের একটি দ্বীপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা কামনা করলাম, দুজন

ওই দূরের দ্বীপটিতে আশ্রয় পেয়ে থাকবে। পাঠক সম্পর্কে, তিনি একজন সুদক্ষ সাঁতারু বলে, আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে তিনি আছেন গ্রেট নাতুনায়।

বিগত ন ঘণ্টার পরিশ্রমে আমরা শ্রান্ত; বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। দীক্ষিত পরামর্শ দিলেন যে আমাদের কোনো ঘেরা জায়গায় যাওয়া উচিত। আমি কিন্তু একপা নড়তেও রাজী ছিলাম না, যদিও দীক্ষিত সতর্ক করলেন, জল উঠে এলে বালি সরে যাবে। সেখানে থেকে যেতে আমি সংকল্প করলাম। দীক্ষিতকে বসে পড়তে সাহায্য করলাম। ভাঙা 'কলার বোনে'র জন্যে তিনি নড়াচড়া করতে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করছিলেন। ওঁকে উঠতে, বা শুয়ে পড়তে সাহায্য করার সময় আমার বিক্ষত পায়ের পাতাতে বেশ ব্যথা করছিল, অবশ্য অসহ্য বোধ হবার মতো এমন কিছু নয়। দীক্ষিত প্রস্তাব করলেন যে তাঁর ভাঙা হাড়খানা আমি বসিয়ে দিই। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে অনভিজ্ঞতার জন্যে পাছে তাঁকে ব্যথা দিই। তারপর তাঁর অনুরোধ আর নির্দেশক্রমে আমি তাঁর ডান হাতখানা সরিয়ে পিঠের দিকে টেনে রাখি।

জামাকাপড়গুলো আমাদের পরবর্তী দুশ্চিন্তার কারণ হল। জামা খুলে, তার থেকে জল নিংড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হাতে একবিন্দু শক্তি ছিল না। কণামাত্র জলও নিংড়ে ফেলতে পারলাম না। শার্টটাকে এপাশ ওপাশে দুলিয়ে শুকিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। তেমনভাবে শুকোতে আমার সারারাত শেষ হয়ে যেত, তাই আমি আবার জামাটা গায়ে দিয়ে নিলাম, আর দুজনে লাইফ-জ্যাকেটের ওপর বালিতে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। আমার ডানপাশে দীক্ষিত।

বেশ শীত। ঘুমোতে পারছিলাম না। কিন্তু আমরা শুয়ে শ্রান্তি আর ব্যথায় ভরা শরীরকে বিশ্রাম দিলাম। দীক্ষিত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন আর শীতে কাঁপছিলেন। হাতে হাত ঘষে আমি তাঁর শরীরকে যথাসম্ভব গরম করার চেষ্টা করলাম। তারপর আমার

বাঁ হাতে আর মুখে তার বুক ঢেকে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সমুদ্রের ধারে ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাকবার পর সজোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল, আমাদের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে আমাদের বাধ্য করল। কিছুক্ষণ সন্ধানের পর ছোট ছোট নারকেল গাছের গোড়ায় একটা ঝোপের আড়াল বেছে নিলাম। গাছের ফাঁকে বাতাস উঁকি দিয়ে যেতে লাগল। তেমন কিছু আশ্রয় এখানে লাভ করি নি। ভিজে জামাকাপড় আর ভিজে শরীর এক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিউমোনিয়া বা জ্বর ধরে যেতে পারে। এমন কিছু একটা দুর্যোগ ঘটলে আমরা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ব। আহার বা পানীয় সন্ধানই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। সাগরে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বুঝি বা জ্বরে, ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় এবার প্রাণ হারাব।

এই অবস্থায় ঘুমোনো অসম্ভব। আমি দীক্ষিতের বাঁ পাশে উঠে বসলাম। তিনি শুধু চোখ বন্ধ রেখে, ঠাণ্ডা হাওয়া সম্পর্কে তাঁর অনুযোগ জানাচ্ছিলেন। চারিপাশে ঘুরে দেখলাম। ইতস্তত অনেক নারকেল গাছের পাতা ছড়িয়ে পড়ে ছিল। আমি উঠে একে একে কতগুলিকে টেনে নিয়ে এলাম। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণার জন্যে, পাতা নিয়ে আসাই আমার পক্ষে প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। পাতাগুলো ওপরে ওপরে সাজিয়ে দীক্ষিতের ডানদিকে তিন ফুট উঁচু একটি আড়াল রচনা করা গেল ; বাতাসের হাত থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো ভাবে আত্মরক্ষা করা যাচ্ছিল এবার। আমি আড়ালটিকে আরো মজবুত করার সংকল্প করছিলাম। কিন্তু আমার একা কাজ করায় দীক্ষিত ইতিমধ্যেই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। জোড়াতালি আড়ালে বাতাসও বহু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল, আর কিছু করতে দিতে চাইলেন না দীক্ষিত, তাই আমি চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।

আমরা কিছুকাল কথাবার্তা কইলাম। সহসা নজর পড়ল, যে গাছের

নিচে আমরা শুয়ে আছি, তার মাথার ওপরেই বড়ো বড়ো নারকেল ঝুলছে। দীক্ষিত কতকটা কৌতুক করে বললেন, "মাথায় ডাব পড়ে মরাটা নেহাতই দুঃখের হবে।" আমি প্রস্তাব করলাম, গাছগুলো বেশ ছোট ; আমার হাত দিয়েই মুখ ঢেকে থাকি।

কিছু পরে, দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমাদের মাথার ওপরে গাছের মাথাগুলোয় উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে। খুশির জোয়ার বয়ে গেল, আর উত্তেজিত ভাবে দীক্ষিতকে বললাম, আমাদের পেছনে কোথাও নিশ্চয়ই পুকুর আছে। চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে গাছের মাথায় এসে পড়েছে। আনন্দ প্রকাশ করার ক্ষমতাও দীক্ষিতের ছিল না। তিনি গভীর ঘুমে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নাক ডাকছিল। অত্যধিক শীত আর ক্লান্তিতে আমার ঘুম আসছিল না ; আর চিন্তা করার পক্ষেও শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। শূন্য চোখে বাতাসে-দোল-খাওয়া পাতাগুলোর দিকে, আর ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া আকাশের পানে তাকিয়ে রইলাম। তার অল্প পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়ে থাকব।

আমার যখন ঘুম ভাঙল দীক্ষিত তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ; আমি লক্ষ্য করলাম যে তাঁর ছেলেমানুষ মুখে ছোট কালো দাড়িটা কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে গেছে আর জোয়ারের জল আমাদের থেকে কয়েক ফুট দূর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। ভাগ্যক্রমে মাঝরাতে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে-ছিল আর আমরা আশ্রয় খুঁজতে এখানে এসে পড়েছিলাম। নইলে আবার জলে ভিজতে হত। যথেষ্ট ভেজা হয়ে গেছে আমাদের। উঠে বসে চতুর্দিকে দেখলাম। নীলে-সবুজে মেশা জল ভোরের লাল আলোয় ঢেউ তুলে চলেছে। অদূরে একটি ছোট দ্বীপ, উৎফুল্ল আর হাস্যমুখ, যেন রাত্রের সুনিদ্রার পর সতেজ হয়ে উঠেছে। ভোরের শীতল বাতাস ভিজে-ভিজে—আর দাঁত বসাচ্ছিল না। ঘন শিশিরে চারিধার বেশ স্যাঁতস্যাতে—প্রায় ভিজে গেছে। দীক্ষিত তখনো

ঘুমিয়ে। তৃষ্ণায় আমর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। খানিকটা জল আমার চাই-ই। গাছের মাথায় চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হয়েছিল, আমার মনে পড়ল। দীক্ষিতকে একা রেখে, এই বসতিহীন দ্বীপে কোনো আশঙ্কা করার নেই মনে করে, আমি পুকুরের খোঁজে উঠলাম। আমি ধীরে ধীরে সেই ঝোপের কাছ পর্যন্ত গেলাম; পরনে ভিজে শার্ট আর ছোট আণ্ডারওয়ার, রক্ত-চিহ্নিত পা পুরোপুরি খোলা। ওপাশে দেখলাম। দেখে নিরাশ হলাম। কোনো পুকুর ছিল না। দ্বীপটির প্রস্থ অতি অল্প। অপর পারের সমুদ্রের ওপরেই চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে গাছে এসে পড়েছিল।

আশান্বিত মনে আমি এগিয়ে চললাম, ডাব কুড়িয়ে পাবার ভরসায়। গত রাতে ঝড় হয়ে গেছে। কিছু নারকেল মাটিতে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। বালির ওপর অজস্র শুকনো নারকেল ছড়ানো। সেগুলো শক্ত খোলাসর্বস্ব, জল বা শাঁস নেই। তখন আমি এগুলোকেই ডাব পেড়ে নেবার জন্যে ঢিলের মত ব্যবহার করব, মনস্থ করি। নিষ্ফল হাস্যকর চেষ্টা করলাম কয়েকবার। আমার শারীরিক সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হলাম। হাতে আর বিশেষ জোর রাখতেও পারছিলাম না। আমি যে শুকনো নারকেল ছুঁড়েছিলাম তা বড়োজোর দশ ফিট ওপর পর্যন্ত পৌঁছল।

পা দুটো শরীরের ভার বইতে পারছিল না বলে, নারকেল গাছে উঠতে পারব এমন সম্ভাবনা ছিল না। কোনোদিনও গাছে চড়ার চেষ্টাও করি নি। কিন্তু এখন জরুরী অবস্থায় চেষ্টা আমার করতেই হবে।

চারিধারে ফলে ভরা অজস্র গাছ, আর প্রত্যেকটি ফল নিশ্চয়ই সুস্বাদ পানীয়ে পূর্ণ। কণ্ঠ আর পাকস্থলীর অনুশাসন হচ্ছিল, গাছে আমাকে উঠতেই হবে। পছন্দমত গাছের খোঁজ করতে করতে নজরে পড়ল যে কতকগুলি গাছে খাঁজ কাটা। দ্বীপে জনবসতি না থাকলেও, বুঝতে পারলাম যে, এখানে সম্ভবত নারকেল সংগ্রহ করতে লোকজন

আসে। আলস্যের অবকাশ আছে আমাদের। নৌকা তৈরী করার চিন্তা লোপ পেল। রবিনসন ক্রুশো হবার আর দরকার নেই। দু-এক মাসের মধ্যে, কিংবা হয়তো তিন-চার মাসের মধ্যে আমরা উদ্ধার হবই। গাছে খাঁজ কাটা দেখেই নিরাপত্তার স্বাদ পেলাম। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল আর খিদেতে পাকস্থলী মোচড় দিচ্ছিল। অতি সত্বর জলের প্রয়োজন। আমি দ্বীপের বাঁক ঘুরে খানিক এগিয়ে গেলাম। দীক্ষিত দৃষ্টির আড়াল হয়ে পড়লেন আর একটি ঝুঁকে-পড়া গাছের দেখা পেলাম। গাছটি সোজা না হওয়ার দরুন আমি গুঁড়ি দিয়ে, অংশত বুকে ভর করে উঠতে পারব, আশা করলাম। তা ছাড়া গুঁড়ির কাছেই বাঁক থাকার জন্যে গাছটি বেঁকে জলের ওপর গিয়ে পড়েছে। গাছের থেকে পড়লে জলেই গিয়ে পড়ব, অতএব অপেক্ষাকৃত কম ব্যথা পাব। গাছটির কয়েক ফিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করলাম বড়ো বড়ো লাল পিঁপড়ের সারি ছেয়ে রয়েছে। তারা কামড়ে মেরে ফেলবে। যদি ওগুলোকে জ্বালিয়ে বা ধোঁয়া দেওয়া যেত তাহলে আমি মাত্র কুড়ি ফুট ওপরের থেকে ডাব পেড়ে আনতে পারতাম। আগুন আর ধোঁয়া। চমৎকার বুদ্ধি। কিন্তু, আগুন জ্বালানো যায় কী করে। আমি সেই ঝোপের কাছে ফিরে এলাম। সেখানে অনেক ছোট সাদা পাথর ছড়ানো ছিল। কিন্তু সেগুলো সব শিশিরে ভেজা। পাতা, নারকেলের ডাল ও ঝোপঝাপগুলোরও সেই দশা। ধোঁয়া আর আগুনের চিন্তা অবান্তর। গাছের কাছে ফিরে এসে, পিঁপড়ে তাড়াবার জন্যে জামাটা খুলতে যাব, চিৎকার শুনলাম, 'হো—আ, হো—আ!' কে ডাকছে দেখার জন্যে ফিরে দাঁড়ালাম। দীক্ষিত হতে পারে না, কারণ চিৎকার করছিল বেশ কয়েকজন লোক আর দীক্ষিতকে যেখানে ছেড়ে এসেছি—তার বিপরীত দিক থেকে। আমি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম; রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে বেশী বিলম্ব হল না। দ্বীপের উত্তর প্রান্তের বাঁক ঘুরে, চীনাদের মতো দেখতে চারজন লোক দেখা দিল। তাদের মধ্যে দুজন বড়ো বড়ো

চেক্‌কাটা শার্ট আর লুঙ্গি পরে ছিল। আর তাদের হাতে ছিল প্রায় বিশ-ইঞ্চি-লম্বা ভোঁতা মুখের লোহার ফলা, ঘাস কাটার জন্যে যে ধরনের ফলা ব্যবহার করা হয়। অপর দুজনের পরনে সাধারণ শার্ট আর ট্রাউজার। মাথায় কালো ভেলভেটের টুপি। আমি শিউরে উঠলাম। "ঘাতকের দল," মনে ভাবলাম; তারা সাহায্যার্থে এসে থাকতেই পারে না। এই নির্জন দ্বীপে ওদের আবাস হলে গত রাতে আমাদের সাহায্যার্থে এল না কেন? কেন তারা আমাদের প্রায় সারারাত ধরে বিপজ্জনক সমুদ্রে নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে ফেলে রাখল? হাতে তাদের ওই ভীষণদর্শন ফলাগুলো কেন? জোরালো সার্চলাইটের কথা স্মরণ হল। আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে, এরা সেই ষড়যন্ত্রকারীদের অনুচর, যারা বিমানটিকে ধ্বংস করেছে আর এখন নৃশংস অবশিষ্ট সাক্ষ্যসূত্রগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় আছে। যত তাড়াতাড়ি পারি, দীক্ষিতের দিকে ফিরে চললাম, কিন্তু বেশী দ্রুত চলতে পারছিলাম না। পিছু হাঁটার প্রতি পদক্ষেপে ওই চারজন আর আমার মনের দূরত্ব কমে আসছিল।

এ কী ভয়াবহ মৃত্যু হবে! অসহায় অবস্থায় টুকরো টুকরো করে কাটবে ওরা। যুঝব আমি, ঠিকই। কিন্তু কেমন করে? অস্ত্র-সজ্জিত চারটে সুদেহ জানোয়ারের সঙ্গে? অসম্ভব। আমি কল্পনা করতে পারছিলাম, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নৃশংস আক্রমণ শুরু হবে। বহু রক্তক্ষরণের পর যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে কিছুকাল পরে প্রাণ হারাব। কিন্তু আমি তবু যুদ্ধে একটা সুযোগ নেবার কথা চিন্তা করলাম। অন্তত ব্যাপারটা ওদের পক্ষে কঠিনতর করতে হবে। তাদেরও, যদি পারি, মৃত্যুর স্বাদ পাওয়াতে হবে। নিশ্চয়ই, কঠিন শুকনো নারকেল-গুলো বেশ কাজে লাগবে। কয়েকটি কুড়িয়ে নেব মনে করলাম। আক্রমণকারীদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারব, সময়মত। না, বরং ওই ভীষণ ফলা হাতে লোক দুটোর একটাকে আগে আক্রমণ করা ভালো, ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সব কজনকে তারপর আক্রমণ করব।

নারকেল কুড়িয়ে নেবার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম। অর্ধেকটা ঝুঁকে পড়ে পরিকল্পনা বদল করার কথা মাথায় এল। প্রতিরোধশক্তিরহিত অবস্থায় দীক্ষিত শুয়ে আছেন। চারজনের বিরুদ্ধে একজন। হাস্যকর প্রস্তাব, নারকেল নিয়ে তৈরী থাকলেও। অপরপক্ষে সম্পূর্ণ অসহায়তার ভান করলে ওরা আক্রমণ বিলম্বিত করতে পারে। আমি একটিও কুড়িয়ে নিলাম না, শুধু হাতের কাছে তিনটি নারকেল রইল, যদি প্রয়োজন হয়

দীক্ষিতের থেকে ফুট তিনেক দূরে, তাকে আগন্তুকদের থেকে অংশত আড়াল করে আমি দাঁড়ালাম। তারা দ্রুতপদে এগিয়ে এল; আর চিৎকার করছিল না। আমদের থেকে প্রায় পনেরো ফুট দূরে দাঁড়াল। তিনজন একসারে আর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, সম্ভবত তাদের নেতা, তাদের থেকে দু-তিন পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে বিশেষ ভঙ্গিতে সিনেমার রেড ইণ্ডিয়ানরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়, তেমনি ধারা কইনুয়ের কাছে বেঁকিয়ে ডান হাতখানা সে তুলল, আর বলল, 'হে···য়'। পরবর্তী ঘটনার সবিস্ময় প্রতীক্ষায় থেকে আমিও একই ভাবে প্রত্যুত্তর জানাই। ওরা সকলে ছ-সাত ফুটের মধ্যে এসে পড়ল; তিনজনে মুখ পাথরের মূর্তির মতো—ভাবলেশহীন। দলের নেতা সামনে এগিয়ে এল, রক্তচিহ্নিত আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে সোজা দীক্ষিতের কাছে গেল। কাঁধের সৈনিক-চিহ্ন খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'ক্যাপটেন।' এই তার প্রথম কথা যা আমাদের বোধগম্য হল। লোকটি চিহ্ন দেখে ক্যাপটেন বলে চিনতে পারে দেখে আমার সন্দেহ ঘনীভূত হল। আক্রমণের কোনো উদ্যোগ না দেখে, মনে করলাম আমাদের জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে তাদের ওপর। তিনজন নিকটতর হলে দীক্ষিত তাকে উঠে বসতে সাহায্য করার জন্যে আমায় অনুরোধ করল। আমি যখন সাহায্য করছিলাম, ওই তিনজনের মধ্যে একজন, মরচে-ধরা ফলাটা হাতের থেকে বালিতে ফেলে দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কী স্বস্তি,

অতঃপর শুধু একজনের হাতেই অস্ত্র। সারাক্ষণ আমি তাকে চোখে চোখে রাখলাম। দীক্ষিত একটি সিগারেট চাইল। অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাবার আমি চেষ্টা করলাম। ফল ফলল। তাদের মধ্যে একজন সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে দিল। বাঁ হাতে ভর দিয়ে দীক্ষিত বসে ছিল বলে সিগারেট ধরতে পারছিল না। দীক্ষিতের অনুরোধে ধূমপান করতেও তারা একজন সাহায্য করল। সিগারেটে খুব জোরে জোরে টান দিয়ে দীক্ষিত বললেন, এমন সুন্দর সিগারেট জীবনে তিনি কখনো খান নি।

সিগারেট আর দেশলাই কোন্ দেশের তৈরী বুঝবার চেষ্টা করলাম। 'সাংহাই' কথাটা পড়তে পারা গেল। আমি নানা রকম ভঙ্গি করে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম বিমান ধ্বংস হওয়ায় আমরা এখানে এসে পড়েছি। বালির ওপরে একটি বিমানের ছবিও আঁকলাম। তাদের মুখের ভার অপরিবর্তিত রইল ; বুঝতে পারলাম না যে, তারা কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, গতরাতে এখানে থাকলে তারা নিশ্চয়ই বিমান ধ্বংস হয়ে পড়া দেখে থাকবে। দীক্ষিত যখন সিগারেট খাচ্ছিল আমি গাছের দিকে দেখিয়ে কয়েকটা ডাব পেড়ে দিতে সঙ্কেত করি, আর বোঝাবার চেষ্টা করি যে আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত। আশা করছিলাম, তাদের মধ্যে একজন গিয়ে গাছে উঠবে। তেমন কিছু ঘটল না। নেতাটি একরাশ কী যেন বলে গেল, আর ওদের মধ্যে একজন অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তাদের একজনকে দিয়ে আমি আগুন জ্বালিয়ে নিলাম। আর দুজনে মিলে দীক্ষিত আর আমার শার্ট তার ওপরে শুকিয়ে নিলাম। শরীরের তাপে আণ্ডারওয়ার ইতিমধ্যেই শুকিয়ে গেছে।

শুকনো জামা যখন গায়ে দিচ্ছিলাম, এমন সময়ে একজন নতুন লোক হাতে এক লম্বা বাঁশ নিয়ে এসে হাজির হল। ওরা আমাদের হত্যা করতে পারে এ দুশ্চিন্তা ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম, দীক্ষিত কী করে অমন শান্ত ছিলেন আর ওদের সহৃদয়তার

সম্ভাবনা ধরেই নিয়েছিলেন। বাঁশ-হাতে সেই লোকটি অনেকগুলি ডাব পাড়ল, লম্বা ছুরি দিয়ে তাদের মাথাগুলো কেটে ফেলল, আর দুজনকে একটা একটা করে দিল। আমরা গিলতে লাগলাম তার মিষ্টি জল, যত মিষ্টি খেয়েছি তার চেয়ে সুস্বাদ লাগছিল! আরো ডাব চাইলাম। জীবন পূর্ণ আবির্ভূত হল। দীক্ষিত দাঁড়িয়ে উঠলেন। নরম শাঁসের কথা তাদের জানালাম। তাড়াতাড়ি লোভীর মতো খেয়ে নিলাম। ওরা বিস্ফারিত চোখে কৌতূহল-আর করুণা-পরবশ হয়ে আমাদের দেখছিল।

যে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তখন সে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। একহাতে একটি থার্মোফ্লাস্ক আর অপর হাতে একটি অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে। একটি কাঁচের গেলাস নিয়ে সে দীক্ষিতেব হাতে দিল আর গরম লালচে চা ভরে দিল তাতে। বেকেলাইটের ফ্লাস্কের ঢাকায় আমাকেও এক কাপ চা দিল। দুধ বা লেবু দেওয়া ছিল না চায়েতে। তবু তার সুন্দর স্বাদে আর গন্ধে মনে হল, এই হল পৃথিবীর সেরা চা—এর চেয়ে ভালো চা কখনো খাই নি। কবোষ্ণ চা গলা দিয়ে নেমে যেতেই গত রাতে মারাত্মক সমুদ্রের বুকে খোয়ানো শক্তি সামর্থ্য অনেকটাই ফিরে পেলাম। তারপর তারা সদ্য তৈরী সাবুর বড়া আর চিনি খেতে দিল। কী চমৎকার খাবার! নির্জন দ্বীপ এক শীতলস্নিগ্ধ বিরামকেন্দ্র আর যাদের ঘাতক বলে মনে করেছিলাম তাদের দেবদূত মনে হতে লাগল। আমাদের অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পেতে লাগল আর ভাবভঙ্গির সাহায্যে কথাবার্তা যথাসম্ভব শুরু করলাম। বালির ওপরে ঘর এঁকে জানতে চাইলাম এই দ্বীপে ওরা কোথায় থাকে। মাছ এঁকে জিজ্ঞেস করলাম তারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে নাকি? যে দিক থেকে ওদের আবির্ভাব হয়েছিল, সেদিক পানে ইঙ্গিত করে আমাদের অনুরোধ করল ওদের অনুসরণ করতে। আমার 'টাই' তখনো লাইফ-জ্যাকেটে। সেটিকে দিয়ে দীক্ষিতের হাত গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখার জন্যে একটা ফাঁস তৈরী করে দিলাম। তারপর আমরা জ্যাকেটঃ

গুলো কুড়িয়ে নিয়ে ত্রাণকর্তাদের সঙ্গী হলাম। প্রায় তিরিশ গজ যাবার পর দলপতি আকাশে একটা ডাকোটা দেখাল। তখন সকাল আটটা। এ নিশ্চয়ই অনুসন্ধানে নিয়োজিত বিমান, ধ্বংসের জায়গায় উড়ে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ ঘুরে বিমানটি চলে গেল।

আন্দাজ করলাম যে, আমরা হেঁটে চলেছি, এই বিনম্র লোকগুলির কুটীরের দিকে। দীক্ষিত, ওদের তিনজনের সঙ্গে, আমার চেয়ে কুড়ি গজ আগে। আমি পা মিলিয়ে চলতে পারছিলাম না, পেছনে পেছনে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক দুটি ছেলে, বছর ষোলো বয়স হবে, তারা আমার সঙ্গী হয়েছিল। স্পষ্টত, তারা দু-চারটে ইংরিজি কথা জানত। আমাদের দুজনকে দেখিয়ে বললে 'ফ্রেণ্ড্স্...'। সত্যি, তারা ভারী ভালো বন্ধু হয়েছিল আমাদের...।

দ্বীপটির উত্তর কোণে একখানি পাহাড়, দ্বীপের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। সমুদ্রের মাঝে হওয়ার জন্যে দ্বীপভরা হালকা সবুজ গাছ-পালায় কোনো মালিন্য ছিল না। সম্ভবত গতরাত্রের বৃষ্টি গাছ-পালাগুলিকে ধুয়ে নির্মল করে দিয়েছে। রৌদ্রস্নানরত জলপরীর মতো দেখাচ্ছিল দ্বীপটিকে। তিনটি ছোট নৌকা নোঙর ফেলা রয়েছে। দুটি সাদা আর একটি নীল রঙ করা। সভ্য জগতে ফিরে এসেছি আমরা। চা, সাবুর বড়া, সিগারেট...নৌকা। আর কী চাই? সেখান থেকে প্রায় কুড়ি গজ গিয়ে দ্বীপটির মাঝে একটি নির্জন কুটীরে আশ্রয় নিলাম। তখন দ্বীপটির সুসম্পূর্ণ ছবি চোখে পড়ল। জন দশেক পুরুষ আর মহিলা, আর জনাছয়েক ছেলে-মেয়ে ছোট দ্বীপটির বাসিন্দা। পুরুষেরা মাছ ধরে, মেয়েরা রান্না করে, আর রোদ্দুরে মাছ শুকোয়। কুটীরের সব অধিবাসীরাই আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। বাইরে মাছ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল শুকোবার জন্যে। মাছ ধরে আর নারকেল কুড়িয়ে এখানকার লোকেরা জীবিকা অর্জন করে থাকে, আর ওরই বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করে। যখন কুটীরে পৌঁছলাম তখন দলপতিকে

দেখি নি। আবার সকলকে চা, সাবুর বড়া, আর চিনি খেতে দেওয়া হল। ছোটদের মধ্যে একজন একটা বোতল থেকে ওষুধ নিয়ে দীক্ষিতের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে লাগল। পরে সে ওটা আমার হাতে দিল। হাজার হাজার মাছি কুটীর ঘিরে ভনভন করছে। অনবরত হাত নেড়ে নেড়ে ক্ষতের থেকে ওদের দূরে রাখতে হচ্ছিল।

ব্যবহার্য জিনিসপত্র, যথা ঘড়ি, সিগারেট ইত্যাদির থেকে বুঝতে পারছিলাম বেশ নিকটেই কোনো বড়ো দ্বীপ আছে, যেখান থেকে এরা এইসব জিনিস সংগ্রহ করে থাকে। বহুক্ষণ দ্বীপটির অবস্থান জানার, আর আমাদের সেখানে নিয়ে যাবার কথা বলার চেষ্টা করলাম। সব চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হল। সারা শরীর লাল হয়ে উঠেছিল আর বোধ করলাম যে জ্বরও বাড়ছে। আশা করলাম যে শেষ পর্যন্ত এ নিমোনিয়ায় দাঁড়াবে। যখন এইসব চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, ওদের দলপতি ছুটে এসে উপস্থিত হল আর বলল, "নৌকা...ডাক্তার...হাসপাতাল।" এই কথাগুলিই যথেষ্ট অর্থব্যঞ্জক ছিল ; বুঝলাম হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে নৌকার ব্যবস্থা হয়েছে। সে আমাদের শিগ্গির যেতে অনুরোধ করল। বুঝলাম যে এ যাত্রা সম্ভবত দূরপাল্লার। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে নিজের হাতঘড়ি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল যে পাঁচ বা সাতঘণ্টা যেতে লাগবে। দ্বীপের অপর পারে অল্প হাঁটতেই ছোট একটি নৌকার কাছে এসে পেঁ ৗছলাম। তার ওপরে একটি বেতের মাদুর পাতা আর এক কোণে ঝুড়িতে কতগুলি বোতল রাখা। ঝুড়ির পাশে চওড়া ধরনের একটি কাঠের তৈরী টুপি পড়ে আছে। মাদুরটি বিশেষ করে দীক্ষিতের জন্যে পাতা। সে খুব আরামে শুয়ে পড়তে পারল। আমি নৌকার পেছন দিকে বসলাম। দলপতি আমাদের পেছনে বসল। সামনের দিকে বসল একটি অল্পবয়স্ক ছেলে। সম্ভবত সে দলপতির ছেলে। আমরা সকলে স্থানগ্রহণ করার পর দলপতি কাঠের টুপিটি মাথায় পরে নিল আর কোলের ওপরে দাঁড় দুটো রেখে প্রার্থনা করল। যাত্রাটি বিপদসঙ্কুল হতে-

পারে, আমার মনে হল, আর যদি সব কিছু সুষ্ঠুভাবে না চলে তা হলে লাইফ-জ্যাকেট পরতে হবে। দ্বীপের সব অধিবাসীরা সপরিবারে সমুদ্রতীরে এসে আমাদের শুভযাত্রা জ্ঞাপন করে গেল। তাদের সরল চোখে অনেক কথার চেয়ে বেশী বাঙ্ময়তা। এই বাঁধা-ধরা জীবনযাত্রায় আবদ্ধ সাধাসিধে মানুষগুলোর হৃদয় সত্যিই হিরণ্য-প্রভ। তারা শুকনো বালির রাজ্য থেকে আমাদের উদ্ধার করেছে, খাদ্য যুগিয়েছে, আর নিয়ে চলেছে এমনই এক জায়গায় যেখানে চিকিৎ-সকের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ বিদায়-দৃশ্য আমাকে বেশ অভিভূত করল।

ছোট একটি বিচিত্র প্রার্থনার পর দলপতি আর তার ছেলে দাঁড় চালাল। নৌকা সবেগে জল কেটে চলেছিল। আমাদের পাশে পাশে দুটি ডিঙিতে এই দ্বীপের অন্য দুজন লোক দ্রুত জল কেটে যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, এ বিদায় সংবর্ধনার এক অংশ কি না। অবিলম্বে আমাদের পার হয়ে তারা সমীপবর্তী অন্য দ্বীপের পানে গেল। আমরা তাদের অনুসরণ করে চললাম। যে দ্বীপে আমরা যাচ্ছি সেখানেই ডাক্তারখানা আছে না কি? দলপতিকে আমি প্রশ্ন করার চেষ্টা করলাম। সে কিছু উত্তর করল আর সঙ্কেতে কী জানাল, তার অর্থ বুঝলাম না। পাশের দ্বীপের কাছাকাছি আসতে আনন্দে আর বিস্ময়ে উত্তেজিত হয়ে দেখলাম পাঠক গাছ-পালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছেন। ডিঙির লোকেরা তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করল। আমাদের নৌকা তিনি দেখেন নি। আমি হাত নাড়লাম; আর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে হুইসিল বাজালাম। হুইসিল শুনে তিনি হাত নাড়লেন। তারপর অন্যদিকে ডিঙির লোক দুজনের সঙ্গে যেতে চলে লাগলেন। পাঠক আর তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে দীক্ষিতকে আমি এক বিস্তৃত ধারা-বিবরণী দিয়ে গেলাম। তাঁর পরনে শুধু 'শর্টস্'। গায়ে শার্টও ছিল না। আমরা দুজনেই আশ্চর্য হলাম যে তিনি গ্রেট নাতুনাতে পৌঁছতে পারেন নি, এসে পৌঁচেছেন প্রায় একই

দ্বীপে। প্রকৃতপক্ষে দীক্ষিত আর আমি এই দ্বীপে পৌঁছবার জন্যেই এক অসফল প্রয়াস করেছিলাম। তাঁকেও ঝড় ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। তীরের বেশ নিকটবর্তী হতেই আমি একটি কমলালেবু জলে ভাসতে দেখলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করি, "দীক্ষিত, এ দ্বীপে কমলালেবু পাওয়া যায়।" পাঠক তখন আমাদের নৌকায় এসে উঠলেন। তাঁর বাঁ হাত একটা ফাঁস দিয়ে ঝোলানো। তিনি প্রস্তাব করলেন মাঝিদের কিছু টাকাকড়ি দিতে। দীক্ষিত আর আমি ট্রাউজারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টাকার ব্যাগও ফেলে দিয়েছি। পাঠক, অদ্ভুত আশাবাদীর মতো তাঁর টাকার ব্যাগ, প্যান্ট খুলে ফেলে দেওয়ার আগে শার্টের পকেটে ভরে নিয়েছিলেন। তিরিশ-চল্লিশটা টাকা তাঁর কাছে ছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, আর যা ছিল সবটাই দলপতির হাতে তুলে দিলাম। বহু প্রতিবাদের পর সে টাকা নিতে সম্মত হল।

আবার একত্রিত হতে পেয়ে আমরা সুখী হলাম। যাত্রা পুনরারম্ভ হল। আর ডিঙ্গি নিয়ে ওরা দুজন নিজেদের দ্বীপে ফিরে গেল। দলপতি তার ঝুড়ির মধ্যে থেকে মোটা পশমের একটা কাপড় বার করল, মাছিতে আমাদের বিরক্ত না করে তার জন্যে পায়ে ঢাকা দিতে। সে তার কাঠের টুপিটা আমায় দিয়ে নিজের ভেল্‌ভেট টুপি মাথায় পরল। পাঠককে সে চা দিল। পাঠক অল্প চা পান করে তাঁর দ্বীপে পৌঁছনোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলেন। ঝড় তাঁকে এই দ্বীপের কাছে এনে ফেলেছিল। তিনজনে ঝড়ের আগে খুব কাছাকাছি ছিলাম বলে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন আমরাও ওই দ্বীপে পৌঁছেছি। অন্ধকারেই তিনি আমাদের সন্ধান করে ফিরছিলেন। 'দীক্ষিত,' 'কারনিক,' বলে ডাক দিয়ে বেরিয়েছেন। সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে, আর ওই দ্বীপেই আমাদের সন্ধান মিলবে এ সম্পর্কে অসন্দিগ্ধ মনে তাঁর দূরের নারকেল গাছের গুঁড়িকে মানুষ বলে ভ্রম হচ্ছিল। তিনি ছুটে যান ; তাকে স্পর্শ করেন ; তারপর হতাশ হয়ে পড়েন। শীঘ্রই মোহভঙ্গ হয়ে এক গাছের তলায়

বিশ্রাম-কাতর ঘুমে ডুবে যান। যখন তাঁর ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়েছে। ছোট দ্বীপটি তিনি দেখে বেড়াতে লাগলেন। দ্বীপটি এত ছোট যে এক ঘণ্টার মধ্যে তার সারা সীমান্ত তিনি ঘুরে এসেছেন। তিনি নিজে ছাড়া ওই দ্বীপে আর জনপ্রাণী ছিল না। তারপর তাঁর ভাঙা হাতের কিছু শুশ্রূষা তিনি নিজেই করলেন। একটি ছোট ঝোপ থেকে শক্ত কাঠি সংগ্রহ করে নিলেন। প্রায় চার-ইঞ্চি-সমান ছোট ছোট টুকরো করে সেগুলো ভেঙে, বাঁ হাতের ভাঙা হাড়ের দুপাশে দুটো করে কাঠি সাজিয়ে রাখলেন। তারপর শার্টের কতকটা ছিঁড়ে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করলেন। আর বাকি অংশটুকু দিয়ে গলার সঙ্গে হাতটা ঝুলিয়ে রাখার জন্যে একটা ফাঁস তৈরী করে নিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা যখন তাঁকে অস্থির করতে শুরু করেছে, তখন পাগলের মতো খাদ্যের সন্ধান আরম্ভ করলেন তিনি। ডাব আয়ত্তের বাইরে। ভাঙা হাত নিয়ে গাছে উঠতে পারবেন না। খুঁজতে খুঁজতে এক 'পাপায়া' গাছের কাছে এলেন। আশা করে সে এক ফল নিয়ে এক কামড় খেয়েই ফেলে দিতে বাধ্য হলেন। ভীষণ তেতো। পান বা আহার না করেই ওঁকে কাটাতে হয়েছে। সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়ল, নিকটবর্তী দ্বীপে মোমবাতির আলো জ্বলছে। বুঝলেন জেলেরা নিশ্চয়ই ওখানে থাকে। ওঁর কাছে যে হুইসিল ছিল সেটা বাজিয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যে হুইসিল শুনতে পেয়েছিল সে অপরপারে দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আরো কিছু পরে আবার ডাক দেবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু তার পরেই দুটি ডিঙি দেখলেন আর আমাদের হুইসিল শুনলেন। "তুমি এই দ্বীপে কোনো কমলালেবু পাও নি?" আমি পাঠককে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার দ্বীপের কাছে আমি একটা কমলালেবু ভেসে থাকতে দেখলাম।"

পাঠক হাসলেন, আর উত্তর করলেন, "এ দ্বীপের লেবু নয়। 'ডিচ' করার সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় আমি বিমান থেকেই একটা পকেটে ভরে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কাজে লেগে যেতে পারে।"
জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে ফেলে দিলে কেন?"

তিনি জবাব দিলেন, “সমুদ্রে ডুবে নষ্ট হয়ে গেছে।”

তাঁর এই চরম আশাবাদিতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। যখন আর সবাই প্রত্যাসন্ন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন পকেটে একটা কমলালেবু নিয়ে নেওয়া বিস্ময়কর।

অভিযাত্রা চলেছে। মাথার ওপরে নির্মেঘ নীল আকাশ। নির্মল নীলে-সবুজে মেশা জল আর কতকগুলি দ্বীপ। আব তাদের ঘিরে রয়েছে গ্রীষ্মমণ্ডলের ঘন নীলিমা। তাপমান মাঝারিগোছের ছায়ায় বেশ শীতল। কিন্তু সরাসরি সূর্যকিরণ এত প্রখর যে একঘণ্টার মধ্যে দেহের যে অংশ উন্মুক্ত ছিল সেখান থেকে ছাল উঠে যেতে শুরু হল। প্রায় একঘণ্টা পর আমরা সেখানে এলাম, গতরাতে যেখানে চারঘণ্টা-ব্যাপী কঠোর সংগ্রাম করেছি। সেই বেগবান প্রবাহ সম্পর্কে এখন আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারছিলাম। নৌকাতে পাঁচজন মানুষ থাকা সত্ত্বেও, যখনি মুহূর্তকালের জন্যে দাঁড় টানা বন্ধ রাখা হচ্ছে তখনি নৌকা পাশের দিকে ভেসে বিপথে চলে যাচ্ছে। আমরা তখনো ভাবছিলাম, কতদূর আমাদের যেতে হবে আর কোথায় চলেছি। আমাদের অঙ্গভঙ্গি-ব্যাখ্যাত প্রশ্নের উত্তরে দলপতি কেবল দক্ষিণের দিকে দেখাচ্ছিল আর বলছিল ‘নাতুনা।’ আমরা জানতাম, যে এই সব দ্বীপগুলি নাতুনা দ্বীপপুঞ্জ বলে পরিচিত। সম্ভবত তারই মধ্যে একটির পানে আমরা চলেছি, আর সেটি অপরগুলির চেয়ে জনবহুল।

বাবার ডায়রিতে আরো লেখা ছিল :

পুনা, ১২ই এপ্রিল ১৯৫৫ সকালে অনিদ্রাকাতর রাত কাটিয়ে সকলে জাগল। সকালের খবর কাগজ আসতে সবাই তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। শিরোনামায় গতরাতের বেতারে প্রচারিত সংবাদ। আর বিস্তারিত খবরে কর্মীদের নাম উল্লেখ করা ছিল :

কমাণ্ডার ক্যাপটেন ডি. কে. জাতার

ফার্স্ট অফিসার ক্যাপটেন এম. সি. দীক্ষিত

ফ্লাইট নেভিগেটর জে. সি. পাঠক

ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়র কে. ডি. কুন্‌হা

ফ্লাইট পারসার সি. ডিসুজা আর জে. পিমেণ্ট

এয়ার হোস্টেস্ মিস্ গ্লোরিয়া বেরি

মেনটেনেন্স ইঞ্জিনীয়র এ. এস. কারনিক

সারা বাড়ি শোকে ছেয়ে গেল। আমার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করলেন, আর অন্যরাও অশ্রু সংবরণ করতে পারল না।

'অভাগী কমল'···(আমার ফিঁয়াসে) কে একজন বললে। আমার সেজো ছেলে মনোহর মার্চেণ্ট নেভির পাইলট, সে বোম্বাই থেকে আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে এসে পেঁছিল। সে জানাল যে, বিমানটিকে সমুদ্রে 'ডিচ' করা হয়েছে। আর সমুদ্র তার বন্ধু। সে কখনো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সমুদ্র অনন্তকে বাঁচাবেই,---সে বলল। তার আশ্বাসে আমরা অনেক সাহস পেলাম।

'কাশ্মীর প্রিন্সেস' বোম্বাই ত্যাগ করার দিন মিসেস্ স্থুলে···(কমলের মা) আর কমলের বড় বোন এরোড্রোমে আমার সঙ্গে বিয়ের দিন (১৯শে মে) পাকাপাকি স্থির করতে দেখা করেছিলেন।

তারপর দিনই---১২ই এপ্রিল ১৯৫৫ বিয়ের উৎসব অভ্যর্থনা আদির জন্যে 'হল' ভাড়া করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা দাদর রেল স্টেশনের কাছে প্রফেসর মোহিলের বাসায় পোদ্দার কলেজ হল ভাড়া করার জন্যে গেলেন। প্রফেসর ভারী আশ্চর্য হয়েছিলেন এই দুই মহিলাকে স্পষ্টত বেশ হাসিখুশী আর আনন্দিত দেখে। সকালের খবর পড়ে তিনি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি ভাবলেন, এই মহিলারা হয়তো বা কোনো সুখবর পেয়েছেন, কিংবা কাশ্মীর প্রিন্সেস আর তার আরোহীদের কী দুরবস্থা হয়েছে তার কিছুই তাঁরা জানেন না।

প্রাথমিক কোনো কথাবার্তার আগেই মিসেস্ স্থুলে হল ভাড়া বাবদ প্রফেসর মোহিলেকে 'ক্যাশ' জমা দিতে গেলেন। নোটের তাড়াটা সকালের কাগজের পাশেই পড়ে ছিল। কাগজখানা যাই হোক

তখনকার মতো মিসেস্ স্মুলে'র প্রতি দয়াপরবশ হয়ে শিরোনামা নিজের দিকে চেপে ছিলেন।

প্রফেসর সে টাকা নিতে রাজী হলেন না, আর মিসেস স্মুলেকে পরে একসময়ে আসতে বললেন।

মিসেস্ স্মুলে প্রফেসরের ব্যবহার ভারী অদ্ভুত মনে করলেন। মিসেস মোহিলে খুব কৌশলে তাঁর মেয়েকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন আর সব বৃত্তান্ত বিবৃত করলেন। মেয়েও সকাল থেকে খবর কাগজ দেখে নি। সে কতকটা সংযত ভাবের ভান করল আর হলে এসে তার মাকে জানাল যে হঠাৎ সে কেমন অসুস্থ বোধ করছে, তার এখনি বাসায় ফেরা দরকার। বাসায় পৌঁছবার আগে পর্যন্ত মার কাছে কিছু প্রকাশ করে নি সে।

আমরা বাট্ বিল্স্ দ্বীপ প্রায় সকাল নটায় ছেড়েছি। এখন আমরা গ্রেট নাতুনার দক্ষিণ কোণের কাছে। সাড়ে এগারোটা বেজেছে। দলপতি জানত যে আমরা ক্ষুধার্ত, তাই সে ঝুড়ি থেকে ভাত আর মাছ বার করল। পাঁচজনে সবটুকু ভাগ করে খেলাম। আমাদের বেশ খিদে পেয়েছিল। এক কণাও পড়ে রইল না। আর মাছটা কী সুস্বাদু! দীক্ষিত এমনকি বললেন যে, একসময়ে তিনি ছোট একটা ছুটি কাটাতে এই দ্বীপপুঞ্জে ফিরে আসবেন আর চা তৈরী আর মাছ রান্নার পদ্ধতিটা শিখে যাবেন। পাঠক আর আমি, এমন দারুণ সুস্বাদু আহারাদির পর খুশী হয়ে ছিলাম; সমুৎসাহে জানালাম যে সেই ছুটি কাটাতে আমরা দুজনেও তাঁর সঙ্গী হব।

দূরে, উত্তরের দিকে, বাট্ বিল্স্-এর আয়তন কমে আসছিল। বড়ো পাহাড়ে ভরা (যে পাহাড় গত রাতে আমাদের দিকদর্শক হয়েছিল) সালোর দ্বীপ ডান দিকে রেখে আমরা পেরিয়ে এলাম। একটি স্টীমবোট দেখলাম একবার তার কাছে আসছে আবার দূরে চলে যাচ্ছে। ওটি নিশ্চয়ই মাছ ধরার নৌকা। দলপতি চিৎকার করে আর রুমাল নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু

চেষ্টা নিষ্ফল হল। স্টীমবোট তার রুটিন অনুযায়ী চলল— মনোযোগ না দেখিয়ে, আর বিব্রত না হয়ে।

হতাশ হয়ে যখন স্টীমবোটের ওই যাতায়াত দেখছি, পশ্চিম দিগন্তে একটি রুপালী ফোঁটা দেখা দিল। সেটি ক্রমশ বড়ো হতে লাগল, প্রথমটির পিছনে আর-একটি দেখা দিল। ওগুলি কয়েকটি বিমান। অল্পপরে তাদের আকৃতি বোঝা যাচ্ছিল। ওগুলি আর. এ. এফ. সাণ্ডারল্যাণ্ড বিমান: আসছে হয় সিঙ্গাপুর, নয়তো হংকং থেকে।

ওরা নিশ্চয়ই সন্ধানে বেরিয়েছে। দুজন তখনো নিখোঁজ: আমরা আশা করতে লাগলাম তাদের হদিশ পাক বিমানগুলো। আমরা তিনজনে দ্বীপ এসে পেঁ ছিতে পেরেছি, অতএব, সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে তারাও কোনো না কোনো দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছে। বিমান ধ্বংসের জায়গা ঘুরে ঘুরে ওই সন্ধানকারী দুটি আমাদের মাথায় ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে যেতে লাগল, মাত্র তিন-চারশো ফুট উঁচুতে। আমরা 'অবজারভার'কে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম বিমানের পেছনের দিকের জানলায়। 'অবজারভার'কে আমরা দেখাতে লাগলাম ঐ দ্বীপের দিকে, যেখানে অপর দুজন থাকতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাঠক বললে, এ দুটি সাহায্যকারী বিমান, অতএব ওদের মধ্যে একটি বিমান সমুদ্রের জলেই অবতরণ করে আমাদের তুলে নিতে পারে। বিমানের দিকে আমরা আমাদের লাইফ-জ্যাকেট তুলে নাড়াতে লাগলাম, (বিধ্বস্ত বিমানের জীবিত অবশেষ আমরা, এই সূচনার নির্ধারিত ইঙ্গিত)। অপর একটি সাণ্ডারল্যাণ্ড বিমান দ্বীপের চারিপাশে খুঁজে বেড়ানোর কাজে এসে যোগ দিল। পাঠক বললেন, "ভাগ্যক্রমে, আমরা কেউ তেমন খারাপ ভাবে আহত নই। এখানে ওদের পেট্রল পুড়িয়ে লাভ কি? ওরা আমাদের সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেতে পারে।" তারপর বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "জলে পড়ে থাকলেই সম্ভবত ওরা আমাদের তুলে নিত। ওরা তুলে নেবে যদি

জানতাম, তাহলে জলে লাফিয়ে পড়তাম।" আমাদের মাথার ওপর ঘণ্টা তিনেক ঘুরে তিনটি বিমানই বিদায় নিল।

দলপতি হতাশ হবার পাত্র নয়। প্রখর সূর্য সত্ত্বেও, সে আর তার ছেলে নাছোড়বান্দার মতো দাঁড় টেনে চলল। আমরা শুধু কথা বলে চললাম। বাটু-বিলিস্ থেকে কতকগুলো মাছি আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। তারা মাঝে মাঝে ভীষণ বিরক্ত করছিল। পায়ের ক্ষত-গুলোকে যথাসম্ভব ঢেকে রাখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু একটা মাছি কোনোক্রমে ঢুকে পড়ে। তাকে তাড়াবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হয়। খোলা ক্ষতগুলোর চামড়া জ্বলে লাল হয়ে গিয়েছিল। বহুদূরে দক্ষিণ সীমান্তে একটি দ্বীপের টালির ছাত দেওয়া বাড়ি দেখা গেল। দলপতির মুখে হাসি ফুটে উঠল; সে ওদিকে দেখিয়ে বলল, "সিধানভ ...ডক্টর...হস্পিটাল..." আমরা আন্দাজ করলাম, সিধানভ সম্ভবত শহরটির নাম, যেখানে আমরা ডাক্তারের দেখা পাব।

সমুদ্রের বুকে দূরত্বের সঠিক ধারণা করা যায় না। সিধানভ এত নিকট বোধ হচ্ছিল; তবু অবিরাম দাঁড় টানার পরও দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে তার লক্ষণ নেই যখন এমনি আমরা ক্লান্তিকর পথ পার হয়ে চলেছি, এমন একটি ডাকোটা বিমান আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সাণ্ডারল্যাণ্ড বিমানগুলির অনর্থক উড়ে বেড়ানোয় ইতিমধ্যে পাঠক খেপে উঠেছিলেন; বললেন, "সাণ্ডারল্যাণ্ডগুলো গিয়ে বোধ ডাকোটাকে বলেছে, এতক্ষণ আমরা ফুর্তি করে উড়ে এসেছি, এবার তোমার পালা।' ডাকোটা আমাদের আশেপাশে আর-একচক্কর দিয়ে অদৃশ্য হল।

সিধানভের কাছে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম একটি ছোট জাহাজ ওর তীরে নোঙর ফেলে রয়েছে। আনন্দে আমি পুলকিত হয়ে উঠি। আশা করি জাহাজটি আমাদের সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেতে পারবে। লাইফ-জ্যাকেট থেকে হুইসিল বার করে উত্তেজনার চোটে আমি এস. ও. এস. (বিপদ-সূচনা) পাঠাতে থাকি। অল্প পরে উত্তেজনা স্তিমিত

হয়ে আসে, বুঝতে পারি, জাহাজ থেকে এখনো আমরা বহু দূরে আছি আর ওদের পক্ষে হুইসিল শুনতে পাওয়ার সম্ভাবনামাত্র নেই। হুইসিল বাজানো বন্ধ করলাম। জাহাজটা তাড়াতাড়ি ছাড়ছে না, আর আমরা সম্ভবত তীরে পৌঁছে ক্যাপটেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব। আমরা জাহাজ সম্পর্কে এত একাগ্র ছিলাম যে সিধানভের ছোট ঘাটের কাছে এসে পড়েছি, বুঝতেই পারছিলাম না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে ঐ 'জেটি' আর সমুদ্রের ধারের প্রায় একশো গজ জুড়ে প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছে। বেশ কয়েকশো স্ত্রী-পুরুষ আর শিশু। স্পষ্ট এই শহরটি বেশ বড়ো, আর সব বাসিন্দারা যেন বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের নৌকা দেখছে। আমি অবাক হলাম, আমরা যে আসছি এরা জানল কী করে? সম্ভবত, যখন হুইসিলে আমি এস. ও. এস. পাঠাচ্ছি কেউ আমাদের নৌকা দেখে থাকবে, আর চেহারা দেখে বুঝে থাকবে আমরা কে। একটি ছোট দ্বীপে সব অধিবাসীদের একত্র হতে কয়েক সেকেণ্ড লাগে।

দলপতি আর তার ছেলের পাঁচঘণ্টা অবিরত কঠোর শ্রমের পর অবশেষে নৌকা এসে দাঁড়াল। সমবেত দর্শকমণ্ডলীর থেকে কয়েক ডজন প্রীতিপূর্ণ হাত এগিয়ে এল, নৌকা থেকে তীরে নামতে সাহায্য করার জন্যে। দশ গজ দূরে একখানি মুদির দোকানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। তিনটি চেয়ার আমাদের জন্যে এল, আশেপাশে প্রত্যেকে আমাদের সুখবিধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর শিশুরা ভিড়ের মধ্যে থেকে আমাদের দেখতে লাগল। আমরা তিনজনে বসে রইলাম; পাঠকের পরনে ছোট সাদা একটি অন্তর্বাস আর ছিন্ন-ভিন্ন জামার অবশেষটুকু হাতে পাকিয়ে রাখা। দীক্ষিত ক্লান্ত, স্বভাবসুলভ হাসি আর মুখে নেই। খুব ছোট একটি আণ্ডারওয়ার আর শার্ট পরে; আমি তাঁর পাশে, তাঁরই মতো বেশে বসেছিলাম। একজন বেশ শক্ত সমর্থ মোটাসোটা ভদ্রলোক, খাঁকি হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্ট পরা,

এগিয়ে এসে সহাস্য অভিনন্দন জানালেন আর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি জানালেন যে বাইরে নোঙর-ফেলা জাহাজটি থেকে তিনি এসেছেন আর খবর দিলেন যে জাহাজটি শিগ্গির ছাড়বে। দুশ্চিন্তা আর দুর্দশাকরুণ কণ্ঠে আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম আর জাহাজের ক্যাপটেনকে জানাতে অনুরোধ করলাম যে তাঁর সঙ্গে কথা বলা আমাদের জরুরী দরকার। তিনি আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন। তার পর তাঁকে দেখলাম মোটর-সন্নিবিষ্ট একটি নৌকায় গিয়ে উঠতে আর সবেগে জাহাজের দিকে যেতে। দোকানে আমাদের কোল্ডড্রিঙ্ক দেওয়া হল। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে ওরা কথা বলছিল। একটি স্কুল-শিক্ষক খানিক বাদে উপস্থিত হলেন। তিনি ইংরিজি বেশ বলতে পারেন। তারপর একজন পুলিশ এসে আমার নামধাম কাজ আর অন্যসব বক্তব্য লিখে নিল। স্কুল-শিক্ষকটি দোভাষীর কাজ করছিলেন। পুলিশটি জানতে চাইল যে আমাদের কোনো পরিচিত আছে কিনা। পাঠকের জামায় তখনো এম্ব্রয়ডারি-করা 'ডানা' আর এয়ার-ইণ্ডিয়ার চিহ্ন ছিল। পুলিশটি আরো কিছু নোট নিল, এরপর মিউনিসিপাল কমিশনার সাক্ষাৎ করবেন জানাল, আর উধাও হল।

পুলিশটি চলে যাবার পর কিছুক্ষণ নীরবতা ঘরে ভরে রইল। এই সুযোগ পরিবেশটিকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হল। আমি উত্তেজিত কণ্ঠে দীক্ষিতকে বললাম, 'গ্যাখো, গ্যাখো, ডক্টর সুকার্নোর ছবি।'

দীক্ষিত বললেন, "এ সব যে ইন্দোনেশিয়ার সীমান্তের মধ্যে।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। বন্ধুত্বপূর্ণ ভূ-ভাগ। এখন বুঝলাম যে সকালে বাটু বিলিস্-এ দীক্ষিত কী করে অমন নিশ্চিত নিরুদ্বেগ ছিলেন। ভারী আফসোস হল যে দ্বীপপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত তা আমি জানতাম না। আগে জানা থাকলে কতখানি যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচা যেত।

কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সামনে সেখানে একঘণ্টার বেশী বসে রইলাম। অতঃপর জানানো হল যে শ খানেক গজ দূরে রেস্ট হাউসে আমাদের যেতে হবে। পাঠক আর দীক্ষিত এগিয়ে চললেন, আর আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছু নিলাম। ছুটি কমবয়সী ছেলে কাছে এগিয়ে এসে তাদের কাঁধে হাত রেখে চলতে অনুরোধ করল। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হলাম। সকলেই খালি পায়ে ছিলাম। জেটির অসমান তক্তা আর উঁচুনিচু পাথুরে পথ দারুণ তেতে ছিল আর বেশ কষ্ট দিচ্ছিল। পথের দুধারে ঘরের সারি; প্রতি জানলার আর দরজায় সোৎসুক দৃষ্টিভরা মুখ। খুঁড়িয়ে চলার কষ্ট দেখে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘর থেকে চেয়ার নিয়ে আমার কাছে ছুটে এল আর আমাকে তাতে বসতে বলল; তারা বয়ে নিয়ে যাবে রেস্ট হাউস পর্যন্ত। আমি তাদের বোঝা হতে অস্বীকার করলাম আর জানালাম পায়ে স্বল্পতম শক্তি থাকলেও আমি হাঁটব। তারা আমার মনোভাব বুঝতে পেরে হাসল, আর আমায় নিজের মতে চলতে দিল।

এই পথটুকুর পর অতি নড়বড়ে একখানা সরু ব্রীজ বেয়ে ছোট একটি খানা পার হয়ে ছোট এক পাকা বাড়ির সামনে এসে পেঁীছলাম। এই হল 'রেস্ট-হাউস,'—ঠাণ্ডা, খোলামেলা আর আরামপ্রদ। তিনটি ক্যাম্পখাট. আমাদের জন্যে বিছানো হয়েছে; সাদা চাদরে ঢাকা আর বালিশ দেওয়া।

তিনজনেই এক-একটা খাটে শুয়ে পড়লাম। এমন আশ্রয়ে বিশ্রাম করা কী আশ্চর্য বিলাসিতা। কত বিপরীত ছিল আমাদের গত 'শয্যা'। আমি যেন বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না যে মাত্র গত-রাতেই আমরা জীবন-মরণ সংগ্রাম যুঝছিলাম। অবিলম্বে 'ডাক্তার' উপস্থিত হলেন। যে কোনো চিকিৎসার জন্যেই এখানে মাত্র একজন পাশকরা কম্পাউণ্ডার আছেন। সহকারীর সাহায্যে তিনি আমাদের ক্ষতস্থানগুলি পরিষ্কার করতে আর 'ড্রেস' করতে শুরু করলেন। যদিও ক্ষতগুলি ছোট ছিল তবু হাতে পায়ে আর সারা শরীরে ছড়ানো ছিল।

রেস্ট-হাউস·সোৎসুক দর্শকে ভরে গিয়েছিল। যদিও বহু লোক জড়ো হয়েছিল, তবু তাদের শৃঙ্খলা ছিল অনুকরণীয়। কোনো শব্দ, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, কিছু নেই। কেউ ঘরেব মধ্যে এসে ঢুকতে চেষ্টা করছে না। দূরের থেকে উঁকি দিয়েই তারা সন্তুষ্ট। জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবী শুধু অনুমতি পেয়েছিল। তারা আমাদের ফল আর বরফে-ঠাণ্ডা পানীয় জল যুগিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

-আমরা ঘুমোবার চেষ্টায় আরামে শুয়ে ছিলাম। তিনজনে চোখ বন্ধ করে আছি, এমন সময় মাথায় সেই আঘাতটার কথা মনে পড়ল। ব্যথা তেমন ছিল, আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, কতখানি কেটেছে। আমি আমাদের 'ডাক্তার'কে বললাম, একবার দেখে নিতে। বিনা-বাক্যব্যয়ে সে একখানি কাঁচি বার করল, প্রায় আমার পিঠের ওপর বসে ক্ষতটার চারিপাশ থেকে চুল কেটে ফেলতে শুরু করল। তারপর সে তার সহকারীকে বললে, সেলাই করার যন্ত্রপাতি তৈরী করে রাখতে। এই দূর দ্বীপে একজন পাশ-না-করা ডাক্তারের হাতে ক্ষত-মুখ সেলাই করানোর কথায় আমি সচকিত হলাম। আমি দীক্ষিতের সঙ্গে পরামর্শ করে জানালাম যে আমি বরং সিঙ্গাপুরে গিয়ে ওই আঘাতের শুশ্রূষা করিয়ে নেব। ডাক্তার আমার দ্বিধার কারণ বুঝতে পেরে আশ্বাস দিল, যে কোনো হাসপাতালে যত নিখুঁত করা যেতে পারে, সেও ততটাই পারবে। আমি অনুমোদন জানালাম। প্রথমত খানিক পেনিসিলিন দেওয়া হল, তারপর আঘাতটি পরিষ্কার করে, যথাবিধি ক্ষতের চারিপাশ অসাড় করে, সেলাই করা হল। পরিষ্কার করার ব্যাপারটা বেশ যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল; তখন চিৎকার করেছিলাম। সেলাই করার এই পর্ব হতে আবার উৎফুল্ল বোধ করলাম। এমন তাড়াতাড়ি, এত কম কষ্ট দিয়ে, আর এমন দক্ষতার সঙ্গে কাজটি শেষ করার জন্যে 'ডাক্তার'কে ধন্যবাদ জানালাম, আর পাঠক আর দীক্ষিতের কাছে চিৎকার করে তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত করেছি বলে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। 'ডাক্তার' বেশ নিপুণভাবে.

তার কাজটি করল। শেষ সেলাইটি করার সময় আত্মবিশ্বাসে ভরা হাসি নিয়ে ব্যঙ্গ করে আমায় প্রশ্ন করল, "যাই হোক, তবু বরং এ কাজটা সিঙ্গাপুরেই করিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।"

আমি বললাম, "এখন বেশ আরাম বোধ করছি। আপনি বেশ ভালো ডাক্তার," আর তারপর তাঁকে আর তাঁর সহকারীকে প্রভূত ধন্যবাদ জানালাম।

দরজার সামনে থেকে সবাই সরে গেল আর এমন কি গুঞ্জনও স্তব্ধ হল। সাদা শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরা তিনজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। আমাদের সামনে তৎক্ষণাৎ চেয়ার রাখা হল আর ওঁরা আসন গ্রহণ করলেন। বেশ হাসিখুশী, চমৎকার মিশুক মানুষ তাঁদের মনে হচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন মিউনিসিপাল কমিশনার বলে আত্মপরিচয় দিলেন। অপর দুজন সহকর্মীর সঙ্গেও তারপর আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন, আর যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে আমাদের তার জন্যে সমবেদনা জানালেন। আশা প্রকাশ করলেন, এই ছোট দ্বীপে আমরা স্বচ্ছন্দে আছি।

দেখা করতে আসা আর এত সুখ-সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম। আর অনুরোধ করলাম দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দকে এত সুন্দর আতিথেয়তার জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে।

তাঁরা বিদায় নিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীরা চলে যাবার মিনিট পনেরো পরে একজন সুদর্শন ইংরেজ ঘরে এলেন। বাইরে নোঙর করা 'তাইপে' জাহাজের চীফ অফিসার বলে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। ক্যাপটেনের আদেশ অনুসারে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তিনি আমাদের নাম ও পদবী লিখে নিলেন আর জানালেন যে প্রথমত তিনি বেতারযোগে ওই নাম ও পদবী সিঙ্গাপুরে পাঠাবেন।

আর কারো জীবিত থাকার সম্ভাবনা আছে কি না, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এ-সব সংবাদ তিনি অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবেন বলে জানালেন। তারপর তিনি বললেন যে জাহাজটি যদিও সিঙ্গাপুর রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তবু আমরা যাত্রার জন্যে তৈরী হওয়ার অপেক্ষা করবেন তাঁরা। মালের জাহাজ বলে 'তাইপে'র সিঙ্গাপুর পৌঁছতে ছদিন লাগবে। তাই পথে এক জায়গায় তাঁরা আমাদের নামিয়ে রেখে যাবেন যাতে একজন বিশেষজ্ঞ জার্মান চিকিৎসকের চিকিৎসার সুযোগ আমরা যথাশীঘ্র সম্ভব পেতে পারি। তার পর পরের যাত্রায় সিঙ্গাপুর যাবার পথে তাঁরা আমাদের তুলে নিয়ে যাবেন। এ যত্ন ও কষ্টস্বীকারের জন্যে পূর্বাহ্নেই আমরা ধন্যবাদ জানালাম আর অনুরোধ করলাম জাহাজের স্টোর থেকে কিছু জামা-কাপড় পাঠিয়ে দিতে, যার দাম সিঙ্গাপুরে গিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে।

যে ভদ্রলোক মারকত আমরা জাহাজের ক্যাপটেনকে খবর পাঠিয়েছিলাম অনতিবিলম্বে তিনি দু-হাত ভরে জামাকাপড় নিয়ে হাজির হলেন। জাহাজের কর্মীদের মাপের জামাকাপড় বলে আমাদের গায়ে বেশ বড়ো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আবার ফরসা জামাকাপড় পরতে পেয়ে আমরা খুব খুশী হলাম। জাহাজটি আমাদের জন্যে প্রায় দুঘণ্টার বেশী বিলম্বিত হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি রেস্ট-হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম, যেখানে প্রায় তিন ঘণ্টার বিশ্রাম, আরাম আর ডাক্তারী-সাহায্য পেয়েছি। দ্বীপের অধিবাসীরা পথের দুপাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। আমরা তাদের বিদায় সংবর্ধনার বিনিময়ে সহাস্যে প্রতি-অভিবাদন জানালাম। জেটির ওপর কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কম্পাউণ্ডার আর জেলেদের সঙ্গে করমর্দন করে ধন্যবাদ জানালাম, আর যারা চারিপাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের বিদায় জানালাম। এত অল্প সময় এখানে কাটিয়ে এঁদের ছেড়ে যেতে দুঃখ বোধ হচ্ছিল। এত অতিথিপরায়ণ সহৃদয় লোক এঁরা, অনেক বেশী দিন থাকতে পেলে খুশী হতাম আমরা।

আর-এক সূর্যাস্ত

মোটর-চালিত ছোট নৌকায় 'তাইপে' জাহাজে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। চীফ অফিসার আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। কম্পাউণ্ডার দুজন জাহাজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁরা চলে যাবার সময় আবার আমরা তাঁদের সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। 'তাইপে'র চীফ অফিসার ক্যাপটেনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ...বয়সী সদাশয় ভদ্রলোক ডিভাইডার হাতে চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী দেখছিলেন। ক্যাপটেন চার্টের ওপরেই ডিভাই-ডারটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এলেন। একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ করমর্দন করে বললেন, "আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভারী খুশী হলাম, যদিও মনে করি, এর চেয়ে সুখজনক পরিস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া উচিত ছিল।"

জলের মধ্যে কতক্ষণ ছিলাম, তারপর তিনি জানতে চাইলেন। "প্রায় ন ঘণ্টা", আমরা বলি। তিনি ভারী আশ্চর্য হয়ে বললেন, "হাঙরের সামনে পড়েন নি? এখানকার সমুদ্র হাঙরে ভরা। কল্পনা করা শক্ত, আপনারা কী করে রেহাই পেলেন। ...যাক, এখানে সচ্ছন্দে থাকুন।" অতঃপর তিনি তাঁর চার্ট নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যাত্রারম্ভের জন্যে তাইপে পুরোপুরি প্রস্তুত। বয়লারে বাষ্প জমে উঠেছে। অচিরে তার প্রপেলর মথিত করবে জলরাশিকে আর সে সমুদ্র ভেদ করে চলবে সুন্দর 'সিধানভ'কে পেছনে ফেলে। পাঁচটা বাজল। সূর্য তখনো উজ্জ্বল। ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ পাশ বেয়ে চলে যাচ্ছে আর তাইপে সগৌরবে বিপত্তিসঙ্কুল সমুদ্রে আপন পথে অগ্রসর হচ্ছে।

তাইপে একটি ছোট জাহাজ। এর পরিসর সীমিত। আমাদের

পক্ষে এ আর-এক সুবিধা। আহত হওয়ার জন্যে আমরা বিনা আয়াসে অল্প দূর যাতায়াত করতে সক্ষম ছিলাম না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমি 'ব্রীজ' আর ডাইনিং রুমের মধ্যে বড়ো জোর পনেরো গজ চলাফেরা করে বেড়াচ্ছিলাম। ডাইনিং রুমের বেশ পরিমিত চেহারা। ডেক্-এর মেঝেতে বসানো একটি কাঠের টেবিল, চারপাশে চারটি চেয়ার। তাইপেতে স্বল্পকাল যাত্রার বেশীর ভাগ সময় আমরা ওখানে কাটিয়েছি। এইখানে বসে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে হতে আমরা আরামের সঙ্গেই সান্ধ্য সুষমা চোখভরে দেখতে পাচ্ছিলাম। বিস্কুট, মাখন আর জ্যাম সহযোগে চা পান করা গেল। এমন স্বাভাবিক সত্যিকারের চা পান দুদিন আগেও করেছি। তখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাঁধা বরাদ্দের মধ্যেই মনে করতাম। কিন্তু এখন আমরা বোধ করলাম যে এমন খাদ্য আস্বাদন যেন বহুযুগ কোনো মরুময় দ্বীপে নির্বাসনে কাটানোর পর কপালে জুটল। চা পর্বের পর আমরা ডেক্-এ গেলাম।

আমরা বেশ আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। ফেনশুভ্র-মুকুট-পরা ছোট ছোট ঢেউ তুলে ঘননীল সমুদ্র ভেদ করে, তাইপে চলেছে। সমুদ্রের ঘন নীলিমা সাদা ফেনার সঙ্গে এক বৈপরীত্য রচনা করছিল, আর তার রমণীয়তা কেউ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার আগেই আর-এক তরঙ্গে আরোহণ করে সে ভেসে চলে যাচ্ছিল মাতৃসমা সমুদ্রের বুকে মিশে যেতে। 'সিধানভ'কে বহুক্ষণ আগেই দক্ষিণ দিকচক্রবালের ওপারে ফেলে এসেছি। ছোট ছোট ঘননীল দ্বীপপুঞ্জও সেই পথে গেছে। ধূসর পিঙ্গল পাথর ঘন-নীল সমুদ্রে মাথা তুলল। অশুভ এক জাদুমন্ত্রে তারা সব মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়। তাদের মোহময় মাধুর্যে আবিষ্ট হয়ে আমরা তিনজন তাকিয়ে রইলাম। স্পষ্টতই তারা ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে এখানে সমুদ্রপথ আশঙ্কাসংকুল। এই কথা চিন্তা করছিলাম আর পাঠক আর দীক্ষিতের সঙ্গে কথা কইছিলাম, ক্যাপটেন ব্রীজ থেকে নেমে এসে আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন। ওই সুবৃহৎ পাথরগুলি নির্দেশ করে তিনি আমাদের জানালেন যে,

জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ 'এমডেন' প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ঐ পাথরগুলির আড়ালে আশ্রয় নিত আর অতর্কিতে শত্রুদের জাহাজ আক্রমণ করত। আমরা কল্পনা করতে পারি, সেই নিরস্ত্র বাণিজ্য-জাহাজের ওপর সহসা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ছবি। জাহাজের আরোহীরা প্রায় সকলেই আবদ্ধ অবস্থায় ডুবে যেত --অন্যরা, যারা ভেসে উঠত তাদের নিশ্চয়ই বেগবান প্রবাহের সঙ্গে যুঝতে হত পরিণামে নৃশংস হাঙরের খাদ্য হবার জন্যে।

হাঙর, সংঘাতিক, মারাত্মক হাঙরেরা, --গতকাল সারা সন্ধ্যে আর আর রাত্তির, সবাই কোথায় গিয়েছিল, ভেবে পাই না। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে আমরা তিনজন, যারা এখন সম্পূর্ণ নিরাপত্তা আর স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছি, তারা যুদ্ধ করছিলাম প্রাণের দায়ে অনিশ্চয়তার প্রতিকূলে।

দীক্ষিত ধূমপান করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, আর নিমেষে, চীফ অফিসার আর পারসার পঞ্চাশটা সিগারেটের তিনটে টিন আর দশটা করে সিগারেটের দুটো প্যাকেট এনে হাজির করলেন। দীক্ষিত বললেন, তিনি চান মাত্র একটি সিগারেট। কিন্তু জাহাজের আতিথেয়তায় অভিভূত হয়ে তামাকের সেই বোঝা বাধ্য হয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে হল।

তাইপে বড়োজোর ঘণ্টা দেড়েক হল যাত্রা করেছে। দুদিন পর দ্বীপে পৌঁছে যে জর্মান চিকিৎসকের শুশ্রূষাধীনে আমায় থাকতে হবে, তাঁর কথা চিন্তা করছিলাম। আমি ছোট শহরে আর শান্ত পরিবেশে থাকতে চিরকাল ভালোবাসি। একটি জনবিরল ছোট দ্বীপ, সরল অধিবাসীদের স্বল্প সীমিত চাহিদা, স্বর্গতুল্য হবে। বাণিজ্য-সভ্যতার বিকাররহিত, আধুনিক উপকরণে সজ্জিত, সহানুভূতিশীল আবহাওয়ার মধ্যে শুশ্রূষায় আরোগ্য দ্রুততর হবে। বেশীক্ষণ এই দিবাস্বপ্নে মগ্ন থাকতে পারলাম না। ক্যাপটেন আবার আমাদের পেছনে এসে দেখা দিলেন, আর সহাস্যে জানালেন, "যাই হোক, আপনাদের সিঙ্গাপুর পৌঁছতে আর অত দেরি হবে না। একটি ব্রিটিশ জাহাজ শিগ্গিরই আসছে

আপনাদের তুলে নিতে। আজ রাতেই যদি তারা যাত্রা করে কাল বিকেলে আপনারা সিঙ্গাপুরে পেঁছিবেন।" এ খবরে সুখী হয়েছিলাম কিনা জানি না। কারণ, মনে মনে তাইপের যাত্রা সম্পর্কে একটা সুখকর স্বপ্ন গড়া হয়ে গিয়েছিল। এখানে কর্মীদের সৌহার্দ্য মর্মস্পর্শী। ব্রিটিশ জাহাজের আগমন সংবাদে আমাদের আনন্দে লাফিয়ে ওঠার কথা। ওর অর্থ, তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে পেঁছানো। আমি তৎক্ষণাৎ ধারণা করতে পারি নি, যে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার আনন্দ গ্রহণ করতে দ্বিধা জাগছিল কেন? অল্প চিন্তার পর স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সরকারি তদন্তের ছবি আর অজস্র বন্ধুদের অজস্রতর কৌতূহলের ক্লিষ্টকর ভিড়।

ভারত সরকারের এক কর্মচারী সিঙ্গাপুরে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে একটা কথা বলেছিলেন, সে কথা আমার চিরকাল স্মরণে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, "জানি, আপনারা অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু আপনাদের সত্যিকার বিপর্যয় এই বার শুরু হতে যাচ্ছে।" বিমানঘেরা সেই আগুন আর ধোঁয়া, জলে বিমানের পড়া কিংবা গভীর সাগরে অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসহায় সংগ্রামের চেয়ে আমার স্নায়ুর ওপরে বেশী পীড়ন করছে সৌহার্দ্য আর সহানুভূতির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত মহল থেকে বিমান-বিধ্বংস-বিষয়ক প্রশ্নাবলীর বোমাবর্ষণ।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা একটি ছোট জাহাজ পার হয়ে এলাম। জাহাজটি দেখতে বিশেষ আধুনিক নয়। ক্যাপটেন জানালেন যে ওটি একটি ইন্দোনেশীয় স্যালভেজ (রক্ষাকারী) জাহাজ, বিমান ধ্বংসের জায়গায় চলেছে। আধ ঘণ্টা বাদে দিকসীমায় ব্রিটিশ জাহাজটি আমরা দেখতে পেলাম। নিষ্কলঙ্ক সাদা তার রঙ। সবেগে আমাদের দিকে আসছে। যত সে কাছে আসতে লাগল ততই তার চেহারা বিশেষভাবে স্পষ্ট হতে লাগল। সুদৃশ্য লম্বাটে ছিপছিপে, স্ট্রীমলাইন বাঁকানো তার ফানেল। ফানেল বেয়ে প্রায় ধোঁয়া বার হচ্ছেই না।

কৌতূহলী হয়ে তাকে দেখছিলাম। সে আমাদের নতুন আবাস হতে যাচ্ছে। 'ড্যাম্পায়ার' রাজকীয়ভাবে পাশে এল 'তাইপে'র, যাকে ইতিমধ্যে স্থির করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ড্যাম্পায়ার আমাদের পেরিয়ে গেল; তারপর ১৮০° ডিগ্রী ঘুরে তাইপের পাশে এসে দাঁড়াল। সারা ডেক্ জুড়ে খালি গায়ে সারি সারি লোক দাঁড়িয়ে; পরনে শুধু হাফ প্যান্ট আর জুতো। স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে তাইপের ক্যাপটেন আমাদের কাছে এলেন। ড্যাম্পায়ারের ভিড়ের দিকে চেয়ে বললেন, "বোধ হচ্ছে, ওখানে তোমাদের এক বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে।" তিনি আমাদের আরো জানালেন যে তিনি ড্যাম্পায়ারের মেডিক্যাল অফিসারকে তাইপেতে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন, যাতে অন্য জাহাজে নিয়ে যাবার আগে দীক্ষিত আর পাঠকের ভাঙা হাড়গুলো পরীক্ষা করা হয়ে যায়।

ক্যাপটেনের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে কইতেই দেখলাম বেশ বড়ো একটি লাইফ-বোট ড্যাম্পায়ার থেকে তাইপের দিকে ছুটে আসছে। এতে লোক দশজনের কম ছিল না। বোটটি পাশে এসে দাঁড়াল আর কেবলমাত্র তুজন অফিসার জাহাজে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ অল্পবয়সী দেখতে, প্রায় ছেলেমানুষের মতো, কিন্তু কঠোর কঠিন হাবভাব নাবিকদের নিয়মশৃঙ্খলা থেকে আহরণ করা। অপর জন সবে তিরিশ পেরিয়েছেন। দাড়ি আছে। প্রাধান্যব্যঞ্জক তবু অমায়িক আর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তরুণ অফিসারটি তাইপের ক্যাপটেনকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রথমে বললেন যে তিনি ক্যাপটেনের পক্ষ থেকে আমাদের ড্যাম্পায়ারে নিয়ে যেতে এসেছেন আর যাঁদের প্রতি আশু মনোযোগ প্রয়োজন ডাক্তার তাঁদের পরীক্ষা করবেন। সেইমত ডাক্তার কর্নি ক্যাপটেনের ঘরটিকে পরীক্ষার ঘর হিসেবে ব্যবহার করলেন আর দীক্ষিত ও পাঠকের ভাঙা হাড়গুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। লাইফ বোটে পার হবার পক্ষে আমরা সবাই যথেষ্ট ভালো আছি বলে তিনি বিবেচনা করলেন। বেশী আড়ম্বর না করেই আমাদের চলে

যাওয়া কর্তব্য। তাইপে জাহাজের ক্যাপটেনের বদান্যতার ঋণ কী করে শোধ করব, আমরা ভেবে পাই না। আমরা তিনজনে তাঁর কাছে গিয়ে বিদায় নিলাম আর আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। পাঠক ফিরে বিলটার কথা জিজ্ঞেস করলেন, সিঙ্গাপুরে তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। ক্যাপটেন বেশ ফুর্তিবাজ; তিনি বললেন, "মাত্র পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।" তৎক্ষণাৎ যোগ করলেন, "এ সবকিছু বিনামূল্যে, হার ম্যাজেস্টির হিসেবভুক্ত।" আমরা হার ম্যাজেস্টিকে আর তাঁকে টাইপে বাস কালে যে সুযোগ আর আরাম উপভোগ করেছি তার জন্যে প্রভূত ধন্যবাদ জানালাম। বারান্দা দিয়ে আসার সময় চীফ অফিসার আর চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা হল। তাঁদেরও ভারী মন নিয়ে ধন্যবাদ জানালাম। সিধানভের অতিথিপরায়ণ দ্বীপবাসীদের ছেড়ে আসার পর, একই দিনে দ্বিতীয় বার ছেড়ে যাচ্ছি অত্যন্ত নিকট বন্ধুদের যাদের সঙ্গে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না।

ড্যাম্পায়ারে পৌঁছানো মাত্র ক্যাপটেন আর জাহাজের অফিসার আমাদের অভিনন্দন জানালেন। একজন অফিসারের হেফাজতে আমায় রেখে পাঠক আর দীক্ষিতকে হাসপাতালের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তাইপে তখনো সেখানে আছে কিনা দেখার জন্যে ফিরে চাইলাম। সে একটি ব্যস্ত জাহাজ। অকারণ আলস্যে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবে না। দূরে তার ক্ষুদ্রায়ত স্টার্ন (জাহাজের পেছন দিক) দেখতে পেলাম। যতক্ষণ না সে দিগন্তের ওপারে চলে গেল ততক্ষণ চেয়ে রইলাম।

ডেক্-এ বসে গল্প শুরু করলাম এক অফিসারের সঙ্গে, যিনি আমাকে কিছু 'পানীয়' অফার করলেন। এমন অফারে আমি দারুণ খুশী হলাম। সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম গেছে, অতএব আমি ভাবলাম, অল্প পান করলে অনেক উপকৃত হব। একটি বড়ো হুইসকি আর সোডা তৎক্ষণাৎ হাজির হল। আমি একটু তাড়াতাড়ি গিলে ফেললাম। এর পুনরাবৃত্তি হল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম তাইপে আমাদের যে

পথ দিয়ে নিয়ে এসেছিল ড্যাম্পায়ার সেই পথ দিয়ে চলেছে। তরুণ অমায়িক অফিসারটি বুঝিয়ে বললেন, সিঙ্গাপুরে আমরা এখনি যাচ্ছি না। এ রাতের মতো ড্যাম্পায়ারকে নাতুনা দ্বীপের কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলে রাখা হবে আর পরের দিন অন্য সম্ভাব্য দুর্গতদের তল্লাস করা হবে, যাদের দুজনকে অবশ্যই আমরা ভাসতে দেখেছিলাম। পরের সন্ধ্যেতে ড্যাম্পায়ার সিঙ্গাপুর রওনা দেবে।

সূর্য অস্ত গেছে। আকাশের রক্তিম আভাও মুছে গেল। ডাক্তার করনি আমার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন এখন আমি শুয়ে পড়তে চাই কি না। হ্যাঁ, অবশ্যই ঘুমোতে হবে। তৎক্ষণাৎ ডেক্-এ এক বিছানা পাতা হল। গ্রীষ্মমণ্ডলে আছি বলে কেবিনের ভেতরে অত্যধিক গরম। তাই বেশীর ভাগ অফিসার টারপলিন দিয়ে ঢাকা জাহাজের ডেকেই ঘুমিয়ে থাকেন। আমি সুখী হলাম যে, রুগীর মতো না করে আমার সঙ্গে অফিসারের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও পা দুটোয় যন্ত্রণা হচ্ছিল তবু সহজভাবেই চলাফেরা করতে পারছিলাম, আর তারই জন্যে আমার এই অতিরিক্ত সুবিধে ভোগ করতে পারছিলাম।

আমার জন্যে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মনে হল যে অল্প জ্বর হয়েছে। পশমী কম্বল দিয়ে শরীর ঢাকলাম। ঘুম আসছিল না। অনড় হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা বেশ আরামদায়ক। ডাক্তার করনি নৈশ ভোজনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আমার কাছে এলেন। এক কাপ সূপ আর কিছু রুটি-মাখন খেতে চাইলাম। যাই হোক, খাদ্যের চেয়ে নিদ্রার প্রয়োজন আমার অনেক বেশী। আমি ডাক্তারকে জানালাম যে আমার অল্প জ্বর হয়েছে আর বোধ হচ্ছে যে ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের হাড় ভেঙে গেছে। উনি বললেন, ভাঙার ব্যাপারটা কাল পরীক্ষা করব। আর টেম্‌পারেচারের বিষয়, যদি অনেক বেশী জ্বর হত তাহলেও আমি অবাক হতাম না। আর হুইসকিতে অবস্থা আরো খারাপ করে তোলে। হায় ভগবান, ঠিক বিপরীত

আশা মনে নিয়ে হুইসকি খেলাম। স্পষ্টত ডাক্তার আমাকে পান করতে দেখেছেন, আর সম্ভবত জানতেন যে এ আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। তবু প্রশ্রয় দিয়েছেন, পান বন্ধ করে দেন নি।

গোধূলির অবশেষটুকু পশ্চিম দিগন্তে মাখা। ড্যাম্পায়ারকে বিমানের ধ্বংসস্থল থেকে আধমাইল দূরে নোঙর করা হয়েছে। অদূরে দৃশ্যমান সালোর দ্বীপ। দূরে গ্রেট নাতুনা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে এমনি এক বিলীয়মান গোধূলি দেখেছি ; আলো হারিয়ে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছিল আমাদের জীবনের আশা। তখন পশ্চিম দিগন্তে অবশিষ্ট ভাসমান তেল জ্বলছিল। তিন জনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারার মতো দূরত্বে ছিলাম। আরো দুজন কিছু দূরে পড়ে আছে, অসহায়ভাবে ভাসছে। কেউ জানত না যে পরের দিন সকালে আমরা জীবিত থাকব কি না। এমন কিছু আশাও ছিল না। সেই দুর্লভ আশার মধ্যে থেকে আমরা জীবিত ফিরে এসেছি আর নিরাপদ আরামে আছি। অন্য দুজনের ভাগ্যে কী ঘটল তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। হয়তো তারা কোনো দ্বীপে ঝড়ে বা শীতে কষ্ট সহ্য করছে। কিংবা আরো খারাপ অবস্থা। প্রার্থনা করলাম, যেন তারা বেঁচে থাকে। আমাদের পাঁচজন ছাড়া বাকী কেউই বিমানটি জলের মধ্যে ডোবার পর আর সূর্যকিরণ দেখে নি।

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে আমি নিশ্চয়ই তন্দ্রার শান্তিতে ডুব দিয়েছিলাম। কে যেন আমায় জাগিয়ে তুলল। গভীর অনিচ্ছায় চোখ খুলে বাঁ পাশে ফিরি আর দেখি আমার শয্যার পাশে কে যেন ডেক্-এর ওপর বসে আছেন। ডেক্ প্রায় অন্ধকার, কেবল ওয়ার্ড-রুম থেকে কয়েকটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছে। শয্যার পাশের ভদ্র-লোক আমার চোখমুখের বিরক্তি ভাব ওই অন্ধকারে নিশ্চয়ই দেখতে পান নি। আমি কিছু বলতে পারার আগেই তিনি বললেন, "একটা ইনজেকশন দিয়ে দেব? ভালো ঘুম হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাই। ঘুমোনোই আমার দরকার। সবকিছুর চেয়ে

বেশী তাই আমি কামনা করছিলাম। যে আমাকে ঘুমনোতে প্ররোচিত করতে পারবে তাকেই আমি সাদরে অভ্যর্থনা করব। ভদ্রলোক ডাক্তার করনির সহকারী। ইনজেকশন দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

স্যুপ আর টোস্ট আমায় এনে দেওয়া হল। খাওয়া শেষ করতে না করতেই ডাক্তার করনির সহকারী এসে উপস্থিত হলেন, "বাড়িতে কোনো খবর পাঠাতে চান না কি ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি জানতাম জাহাজ থেকে কোনো তারবার্তা বাড়িতে পাঠানো সম্ভব নয়। এ সুযোগ কেবল অতি সম্মানিত ব্যক্তিরাই পেয়ে থাকেন। প্রস্তাবে বিস্ময়ান্বিত হই। তাঁর কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তিনি নিশ্চয় এয়ার ইণ্ডিয়ায় সংবাদ পাঠাবার কথা বলতে চাইছেন। আমি বার বার জিজ্ঞেস করলাম তিনি যা বলছেন, সত্যিই তাই বলতে চাইছেন নাকি ? তাঁর আশ্বাস পেয়ে মায়ের কাছে একটা চিঠি লিখি। জানতাম যে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন। আমার তরফ থেকে ব্যক্তিগত তারবার্তা প্রভূত আনন্দ দেবে। আমি আরো ভাবলাম যে আমার ফিঁয়াসেকেও একটা খবর পাঠানো উচিত। সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, "আর একটা তার পাঠাতে পারি কি ?" জবাব পেলাম. "নিশ্চয়ই।"

আমি একটি প্যাডে দুটি তারবার্তা আর সংশ্লিষ্ট ঠিকানা লিখে দিই। এতক্ষণে বোধ করলাম, বুকের ওপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। আমি অনুভব করছিলাম যে কিছু একটা আমার স্বস্তিকে ব্যাহত করছিল। কী যেন একটা বিবেকে বিঁধছিল। কী সে কারণ, বুঝতে পারি নি। খবর দুটো পাঠিয়ে বুঝতে পারলাম, কিসের সে দুশ্চিন্তা। অপর আত্মীয়রা আর আমার মা ও ফিঁয়াসে ভীষণ আশঙ্কায় আছে— এই দুর্ভাবনা এতক্ষণে আবিষ্কার করলাম। এবার আমার মন সত্যিই শান্ত হল, যদিও সম্পূর্ণ নয়। আমার তারবার্তায় ছিল, "বেশ ভালো আছি, শিগ্গির লিখছি।" আমার প্রায় কোনো আঘাত লাগে নি. তবু আমি জানতাম, এ কথা তাঁদের বিশ্বাস করানো ভীষণ শক্ত যে,

এমন মারাত্মক এক বিমান-ধ্বংসের মধ্যে থেকে নিরাপদে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে। আমার আত্মীয়েরা ভালো করেই জানতেন যে সাধারণত আমি আঘাতের কথা কম করেই লিখব, যত সত্যিই হোক আমার তারের কথা, পুরোপুরি ওঁরা বিশ্বাস করে নেবেন না প্রথমে।

মন এমন হালকা হয়ে যাওয়ায় প্রায় সারারাত সুনিদ্রা হল।

রেওয়া—বিন্ধ্য প্রদেশের পূর্বতন রাজধানী, একটি ছোট শহর। আমার 'ফিঁয়াসে' এই শহরে তার বাবার একটি ছোট বাংলোতে বাস করছিল। বাড়িতে কোনো রেডিও ছিল না। কলকাতাতে ছাপা অমৃতবাজার পত্রিকা শহরে প্রচলিত। তাই রেওয়াতে খবর আসে চব্বিশ ঘন্টা পরে। যেহেতু কমলদের রেডিও ছিল না, সর্বশেষ সংবাদও পায় নি, তাই সে প্রথম টেলিগ্রাম হাতে পেল আমার ভাইএর কাছ থেকে, "অনন্ত নিরাপদে আছে : চিন্তা কোরো না। বোম্বাই—১২. ৪. ৫৫।" এ টেলিগ্রাম ওকে ধাঁধায় ফেলল। এর অর্থ কী, সে বুঝতে পারছিল না। বিশদ বিবরণী সে জানতে চাইছিল। একটি 'এক্স্‌প্রেস ডেলিভারি' চিঠি লিখে সে আমাকে পাঠাল। পরের দিন অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতীয় এয়ার লাইনারের হংকং থেকে জাকার্তার পথে বিধ্বংস হওয়ার সংবাদ নিয়ে এল। তখন সে আগে পাওয়া টেলিগ্রামের মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারল। সেদিন কিছু পরে সে এইচ. এম. এস. ড্যামপায়ার থেকে আমার পাঠানো টেলিগ্রাম পেল "সম্পূর্ণ নিরাপদ, শিগ্গির লিখছি।"

বিমান ধ্বংস হওয়ার এই বিলম্বিত সংবাদ তাকে বহু মনোবেদনার হাত থেকে রেহাই দিয়েছে।

বিমান ধ্বংসের মাঝ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, কিন্তু আঘাতগুলির অবস্থা? এমন অবস্থায় অক্ষত ফিরে আসা তার কল্পনাতীত। তখন সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল আর পোস্ট অফিসে গিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের কাছে একটা টেলিগ্রাম, দিল "দৈব-নিষ্কৃতির জন্যে অভিনন্দন, স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার করে জানাও।"

প্রচারিত সংবাদ

সিঙ্গাপুর, ১২ই এপ্রিল, ১৯৫৫

ব্রিটিশ রয়াল এয়ার ফোর্স খবর দিচ্ছেন, যে তিনজন জীবিত আছেন। তাঁরা সবাই এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশানালের কনসটেলেশন বিমান কাশ্মীর প্রিন্সেসের কর্মী। আর. এ. এফ. জানাচ্ছেন যে রক্ষা-পাওয়া কজনকে ব্রিটিশ নেভির জাহাজ এইচ. এম. এস. ড্যাম্পায়ারে তুলে নেওয়া হয়েছে···সিঙ্গাপুরের ২৫০ মাইলে উত্তরপূর্বে জাহাজটি বিমান ধ্বংসের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়।

(—ইউ. পি. এ. ও দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া নিউজ সারভিস্)

লণ্ডন, ১২ই এপ্রিল, ১৯৫৫

চীন আজ রাত্রে যুক্তরাজ্য এবং কুয়োমিংটাং চীনকে "কু-ইচ্ছা-প্রণোদিত ব্যবস্থাপনায়" চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন লাই এবং এশিয়া-আফ্রিকা বান্দুং সম্মেলনের অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে গত কালের বিমান দুর্ঘটনা সংঘটিত করার অপরাধে অভিযুক্ত করে।

এখানে সংগৃহীত পিকিং বেতারে বলা হয়, হতভাগ্য বিমানটি হংকং ত্যাগ করার পূর্বে চীন গণতন্ত্রের সরকার জানতে পারেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্ত সংগঠন ও চিয়াং কাই-শেকের গুণ্ডারা বান্দুং সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে যাবার জন্যে নির্দিষ্ট ভারতীয় বিমানটি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে, যাতে চীনা প্রতিনিধিদল ও এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনকে বানচাল করতে পারে।"

বেতার বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে, ১০ই এপ্রিল সকাল সাড়ে নটায়, চীনা মন্ত্রিসভার বৈদেশিক বিভাগ পিকিংএর ব্রিটিশ চার্জ ডি-অ্যাফেয়ার্সএর অফিসকে এ সম্পর্কে জানান এবং তাঁদের

অনুরোধ করা হয় যে, হংকং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাতে যাতে তাঁরা চীনা প্রতিনিধিবর্গ ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন।

"ব্রিটিশ চার্জ ডি-অ্যাফেয়ার্সের অফিসাররা হংকংএর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এ বিজ্ঞপ্তিটি পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।"

(—ইউ. পি. এ. ও টাইম্স অফ ইণ্ডিয়া নিউজ্ সারভিস্)

হংকং, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৫৫

হংকং সরকারের এক মুখপাত্র স্বীকার করেন যে, পিকিংস্থিত ব্রিটিশ চার্জ ডি-অ্যাফেয়ার্স এখানকার কর্তৃপক্ষকে সাবধানবাণী পাঠিয়েছিলেন যে, চীনা সরকার এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের কন্স্টেলেসন বিমানটিকে স্যাবোটাজ করার ষড়যন্ত্র সন্দেহ করেন। সেই সাবধানবাণী অনুসারে তিনি জানান, "আমরা স্বাভাবিকের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করি।"

—রয়টার

হংকং, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৫৫

হংকংএর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আজ বলা হয় ভারত থেকে আসার পর এবং বান্দুংএর জন্য টেক্-অফ এর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সকল সময়ে বিমানটিকে কড়া পুলিশ নজরে রাখা হয়।

আরো বলা হয় যে, একথা প্রায় অসম্ভব যে বিমানে কিছু প্রোথিত করা হয়ে থাকতে পারে······

(—ইউ. পি. আই. এ. এফ. পি.)

ডেক-এর উপরে তিনটি কফিন

যখন আমার ঘুম ভাঙল, আকাশের তারারা উধাও হয়েছে আর চারিপাশে সমুদ্র উজ্জ্বল। যদিও সবেমাত্র ছটা বেজেছে, সূর্য বেশ উঁচুতে উঠে পড়েছে। অগণিত ঢেউএর চূড়া সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। চারিপাশের দ্বীপপুঞ্জ সতেজ সবুজ গাছপালার সজ্জায় শিশিরবিন্দুর মতো কমনীয়। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাদের। এ সব উজ্জ্বলতার পরিবেশে একটা সুতীক্ষ্ণ তিক্ততা বুকে বিঁধে ছিল। আমি আরামে ঘুমিয়ে ছিলাম কিন্তু অপর দুজন ভয়ঙ্কর রাতের ভীষণ অন্ধকারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কোথায় ভাসছে, কে জানে?

শান্ত পারিপার্শ্বিক ডেক্-এর কোণের ব্যস্ততায় ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। একটি লাইফ-বোট জলে নামানো হচ্ছিল। রেলিং অবধি আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গেলাম। দুটি লাইফ-বোট ইতিমধ্যে ছেড়ে চলে গেছে গ্রেট নাতুনা দ্বীপের দিকে। আরো দুটি এঞ্জিনের গর্জন তুলে, ঘননীল সমুদ্র মন্থন করে সাদা ফেনা জাগিয়ে ত্বরিতে সালোর দ্বীপের পানে যাত্রা করল। তা ছাড়া আরো দুটি শেষে নামানো হয়েছে; সারাদিনব্যাপী সন্ধান-কাজে নিয়োজিত হবার আগে শেষবারের মতো পরীক্ষিত হচ্ছে। ছটি মোটর বোটের মধ্যে তিনটির পেছনে ছোট দাঁড়টানা নৌকা বেঁধে দিয়ে যাওয়া হবে, যেগুলি দ্বীপের আশেপাশে অগভীর জলে বাইতে পারা যাবে। তরুণ অফিসারটি, যাঁর সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় আমি হুইসকি পান করেছিলাম, তিনি ওয়ার্ডরুম থেকে বাইরে এলেন। শেষের দুটি নৌকা তাঁরই পরিচালনাধীনে। স্মিতমুখে আমার পাশে এসে শুধোলেন, "ভালো ঘুম হয়েছিল তো?"

"বেশ ভালো, ধন্যবাদ," আমি বললাম।

"আমরা দুর্ঘটনার পর আর যাঁরা যাঁরা প্রাণরক্ষা পেয়েছেন

তাঁদের সন্ধান শুরু করতে চলেছি” তিনি জানালেন। যেহেতু আমি বিমানটি জলে পড়ার যথার্থ জায়গাটা জানতাম, তাই আমি কিছু অংশে অনুসন্ধানকারীদের দিক নির্দেশ করতে পারব, বলে আশা করি। আমি অফিসারটিকে বললাম, “জীবিতদের যে জায়গায় ভেসে যাবার সম্ভাবনা আমি তা জানি। আমি আপনাদের সঙ্গ নিতে পারি কি?”

তিনি একটু হাসলেন আর বললেন, “আমরা সারাদিন বাইরে থাকব। আপনার বরং জাহাজে থাকাই ভালো। বোধ হয় এই আপনার যথেষ্ট হয়েছে।” বুঝতে পারলাম, আমায় সঙ্গী করে নিতে তাঁকে রাজী করাবার সব চেষ্টা নিষ্ফল হবে। তাই সম্ভাব্য জায়গাগুলি দেখিয়ে তার সাফল্য কামনা করলাম। তিনি মোটর বোটে চড়ে পড়লেন।

আমি মোটর বোটের গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ডাক্তার করনি এমন সময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করলেন, “ভালো ঘুম হয়েছিল তো?” “বেশ ভালো। ধন্যবাদ, ডক্টর।” আমি বললাম।

“স্নানের জন্যে তৈরী” এই কথা প্রশ্ন করে তিনি আমায় স্নানের ঘরের দিকে নিয়ে চললেন। সেফটি রেজর, দাড়ি কামাবার ক্রীম আর স্নানের সাবান আমার জন্যে রাখা ছিল। দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে নিতে পারেন, ডাক্তার জানালেন। কিন্তু আমার দৃষ্টি আবদ্ধ হয়েছিল বিরাট সাদা বাথটবে। দৃশ্যটাই আমায় মুগ্ধ করেছিল। কী চমৎকার হবে যদি ওই বাথটবটায় আমি স্নান করতে পাই,—আমি মনে মনে ভাবলাম। কী শোচনীয় ব্যাপার যে আমার হাত আর পায়ে ব্যাণ্ডেজের ঘের আর স্নানের আরামটা হারাতে হবে। কেউ কেউ স্নানের শখ দেখে হাসতে পারেন, আর বলতে পারেন, “যথেষ্ট চোবানি কি ইতিমধ্যে হয় নি?” কিন্তু আসল কথা, যদি কখনো অর্ধমৃত অবস্থায় জল থেকে টেনে তোলাও হয়, তবু বাথটবের অপ্রতিরোধ্য

আকর্ষণ আমার বজায় থাকবে। ডাক্তার করনি যেন মনের কথা পড়তে পারলেন। আমায় চমক লাগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "যদি স্নান করতে ইচ্ছে করে, করতে পারেন।" তারপর আরো বললেন, "ব্যাণ্ডেজ ভিজে যাবার চিন্তা করে দরকার নেই; আবার নতুন করে দেওয়া যাবে। শুধু লক্ষ্য রাখবেন মাথায় যেখানে সেলাই করা সেখানটা ভেজাবেন না।"

সেই আরামপ্রদ স্নানের ঘরে পুরো সুখ উপভোগ করলাম আর পরে তাইপের দেওয়া জামাকাপড় গায়ে দিয়ে দরজা খুলে চিন্তা করছি ডিসপেনসারির পথ খুঁজে পাব কী করে? বিশেষ কষ্ট হবাব কথা নয়। যাই হোক, জাহাজেই কোথাও আছে যখন······দরজার পাশে ডাক্তার করনির ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা নজরে পড়ল। এখানে তিনি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলেন। পায়ের ব্যথা নিয়ে আমি চারিধারে ঘুরে বেড়াই - তা তিনি চান না। তিনি পথ দেখিয়ে আমায় জাহাজের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। এখানে এসে পাঠক আর দীক্ষিতকে দেখলাম। ওপর ওপর দুটো বিছানায় তাঁরা শুয়ে। তাঁদের বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। পাঠকের হাত ইতিমধ্যে প্লাস্টার করা হয়ে গেছে, আর ওপরে তুলে বাঁধা আছে। দীক্ষিত নির্বিকার চিত্তে সিগারেট খেয়ে চলেছেন। আমরা অভিনন্দন বিনিময় করলাম। নতুন ড্রেসিংএর জন্যে একটা উঁচুমত সিন্দুকে বসলাম। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে দিতে ডাক্তার করনি জানতে চাইলেন, ব্রেকফাস্টে কী খাবার খেতে চাই আমি। আমাদের তিনজনের জন্যে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন তিনি। ক্ষতগুলো সব ড্রেসিং হয়ে গেলে আমি দীক্ষিতের পাশে একটা টুলে এসে বসলাম। তিনি নীচের বাঙ্কে ছিলেন। ডাক্তার আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, "ব্রেকফাস্টের পর আবার এখানে ফিরে আসতে পারেন।" তাঁকে অনুসরণ করে ডাইনিংরুমে এলাম। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন ঘর ফাঁকা। মনে হল, আর সবায়ের ব্রেকফাস্ট সমাধা হয়ে গেছে। আমি আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে,

যাবতীয় খাদ্য, যা ডাক্তার করনির ডিস্‌পেনসারিতে বসে উল্লেখ করেছিলাম, সব টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হল। দেখে অবাক হলাম। আমি বসে ধূমায়িত গরম পরিজ আর ভাজা ডিম খেতে শুরু করা মাত্র ডাক্তার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সূর্যদীপ্ত ওয়ার্ডরুমে আমি একা রইলাম, কেবল এক চীনা বেয়ারা আমার তত্ত্বাবধানে রইল।

কফির কাপে শেষ চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার করনি এসে পৌঁছলেন। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড যে স্নান করা মাত্র, বা কফি শেষ হওয়া মাত্র ডাক্তার প্রতিবারই উদয় হচ্ছেন যেন বন্ধ দরজার ওপারে বা দূরের ওয়ার্ডরুমে কোথায় কী হচ্ছে তিনি সব দেখতে পান। প্রতিবার যথাসময়ে এসে তিনি আমাকে ওয়ার্ডরুমে, স্নানের ঘরে, জাহাজের হাসপাতালে বা ডেক্‌এ আমার বিছানা নিয়ে গেছেন। যখনি ঘুম ভাঙুক না কেন, তাঁকে দেখেছি– তাঁর ধবধবে সাদা পোশাকে। অনলস ভাবে শান্ত সংযত গলায় তিনি প্রশ্ন করেছেন, "ভাল ঘুম হয়েছিল তো?" প্রথমে তাঁর এই সর্বত্র বিরাজমান অবস্থা দেখে অবাক হয়েছিলাম। ক্রমে তাঁর উপস্থিতি আশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছল, কখনো কখনো আমি ধরে নিলাম যে তিনি থাকবেন। মাকে সব সময় শয্যার পাশে পেয়ে শেষ পর্যন্ত শিশুর যেমন মনোভাব হয় তেমনি আমারও মনের অবস্থা। একটুও অতিরঞ্জিত না করে বলা যায় যে ডাক্তার করনির কাছে আমরা মাতৃসম যত্ন পেয়েছি। তাঁর ছবিখানি ডাক্তার হিসাবে একেবারে নিখুঁত- স্নেহপ্রবণ, মনোযোগী, তবুও প্রয়োজনমত বেশ কঠোর।

ওয়ার্ডরুম থেকে আমরা হাসপাতালে যাত্রা করলাম। আমি খুঁড়িয়ে চলছিলাম। ডাক্তার আমায় অনুসরণ করছিলেন। যেতে যেতে ডাক্তার বললেন, "আপনার একটা লাঠি দরকার। তাতে অনেক সাহায্য হবে।"

লাঠি? না না। লাঠি ব্যবহার করতে আমার ভালো লাগবে না। অন্তত যতক্ষণ না হলে চলে, ততক্ষণ নয়। কী ক্ষতি হয়, যদি পায়ে

লাগে আর আমি একটু খুঁড়িয়ে চলি। এই কিছুদিন আগেই ডগলাস বেডার-এর জীবনচরিত পড়েছি। এই লোকটি লাঠি ছোঁয় নি, যদিও তার ছুটো পা-ই কেটে ফেলা হয়েছিল। আমি ভাবলাম এ একটা লজ্জার কথা হবে যদি আমি সামান্য আহত পা নিয়ে চলাফেরা করতে লাঠির সাহায্য নিই। আমি ডাক্তার করনিকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, "ডাক্তার, আমার মনে হয় না যে লাঠির কোনো দরকার আছে। তা ছাড়া জাহাজে বারান্দাগুলো এত সরু, সব সময়েই হাতের কাছে একটা সাহায্য থাকবেই। ডাক্তারের মনের ওপর এ কথার কী প্রতিক্রিয়া হল তা আর আমার খুঁটিয়ে দেখতে সাহস হল না। তিনি কিছুই বললেন না। আমি বুঝলাম তিনি মত বদল করেন নি। নীরবতা অনেক সময়ে জোর গলার প্রত্যাখ্যানের চেয়ে মর্মস্পর্শী হয়।

দীক্ষিত আর পাঠকের সঙ্গে গল্পগুজব করে হাসপাতালের কেবিনে প্রায় ছুটি মনোরম ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। তারপর ওয়ার্ডরুমে ফিরে এলাম। জনাকয়েক অফিসার বসে ছিলেন। প্রত্যেকেই হাতে পত্রিকা বা সংবাদপত্র নিয়ে, মাঝে মাঝে নীচুগলায় গল্প-গুজব করে অবসর বিনোদন করছেন। বন্ধুত্বপূর্ণ আসরে আমায় সবাই তাঁরা অভ্যর্থনা করে ডেকে নিলেন। আমার জন্যেও বীয়র অর্ডার দেওয়া হল। অবিলম্বে এক চীনা বেয়ারা এক মগ সুস্বাদু শীতল বীয়র এনে দিল। আমার মনে হয়, আনন্দ আর ফূর্তির অর্ধেকটার জন্য আমি এই পানীয়ের কাছে ঋণী। বীয়র এবং হুইস্কি আমাদের যন্ত্রণায় এক প্রলেপ বিশেষ। আর অপর অর্ধেকের জন্য আমি ভ্যাম্পায়ারের কর্মীদের কাছে ঋণী। তাঁদের অন্তরঙ্গ ব্যবহার, সহৃদয়তা আর আতিথেয়তা আমাদের পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিল। হাঁটতে গেলে ছুপায়েই বেশ ব্যথা বোধ হচ্ছিল, তা সত্ত্বেও ঘুরে বেড়ানো আনন্দদায়ক লাগছিল কারণ যেখানেই যাই সেখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে একজনের মধুর হাসি।

আমার পাশে বসে ছিলেন লেফটানেণ্ট হিউয়েস ও জাহাজের ডাইভিং অফিসার। শীতল বীয়রে চুমুক দিতে দিতে আমরা কথাবার্তা

শুরু করলাম। যখনি জানতে পারলাম যে তিনি একজন ডাইভিং অফিসার আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা নীচে বিমান পর্যন্ত যেতে পারেন না? তাহলে আমরা জানতে পারতাম, কতজন বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।" আরও কতজন বেঁচে আছে, সে সন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত জাহাজের অপেক্ষা করার কথা। জলের নীচে গিয়ে অবশিষ্ট কর্মী আর যাত্রীদের ভাগ্যে কী ঘটল তার হিসাব করার তখনও অনেক সময় ছিল। লেফটানেন্ট হিউয়েস মৃদু হেসে জানালেন, "আমরা আগেও সে কথা ভেবেছি। ইন্দোনেশীয় সরকার জলের নীচে যাবার অনুমতি দিতে নারাজ।" এখানে ইন্দোনেশীয় সমুদ্র আর জলের নীচে বিধ্বস্ত বিমানের সন্ধান করার জন্যে তাঁদের অনুমতি একান্ত প্রয়োজন ছিল। তবু আবার অনুরোধ জানানো হয়েছে আর লেফটানেন্ট আশা প্রকাশ করলেন এবার অনুমোদন লাভ করা যাবে।

অনতিবিলম্বে আমরা বিমানটির কথা ভুলে সমুদ্রের গল্প, নাবিকদের আর জাহাজের গল্পে এসে পড়লাম।

কে একজন প্রায় ছুটে ওয়ার্ডরুমে এসে ঢুকল আর লেফটানেন্ট হিউয়েসকে আধা-ঘোষণার ঢঙে জানিয়ে গেল, 'অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' লেফটানেন্ট হিউয়েসও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হলেন। একে একে তাঁরা সকলে ওয়ার্ডরুম্ ত্যাগ করে গেলেন। আমি জানতাম যে ডুবুরীর যন্ত্রপাতি কাজে লাগানোর জন্যে তাঁরা প্রস্তুত করছেন। তখন এগারোটা। দিনের অর্ধেক গত হয়েছে। সূর্যাস্তের পর অনুসন্ধানী দল ফিরে এলে আমরা সিঙ্গাপুরের দিকে যাত্রা করব। ডাইভের কাজ শুরু করতে করতে একটা বা দুটো বাজবে। মাত্র তিন বা চার ঘন্টা সময় তাঁরা পাবেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে ওঁরা সবাই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমি নিবিষ্টচিত্তে ডেকের দিকে চেয়ে রইলাম, লেফটানেন্ট হিউয়েস আবার ফিরে আসতে পারেন এই আশায়। আমি ভাবলাম, উনি জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার আগে ওঁর সঙ্গে কথা বলতেই হবে। তাঁদের এই প্রয়াসে

যথাসম্ভব সাহায্য করতে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম। আমি জানতাম যে কনস্‌টেলেশনের নির্মাণপদ্ধতির সঙ্গে লেফটানেণ্ট হিউয়েসের পরিচয় থাকতেই পারে না। যদি আমি ওঁকে কয়েকটি বিষয় বলে দিতে পারতাম তাহলে ওঁর প্রচুর সাহায্য হত। জলের নীচে তিনি খুব কম সময়ই পাবেন। কী করে দরজা খুলতে হয় তা নিয়ে বেশী গবেষণার সময় পাবেন না। দরজা খুঁজে পাওয়াই এক দুষ্কর কাজ হবে। খোলা প্রায়ই অসম্ভবের সামিল যদি না পূর্বাহ্ণে জানা থাকে পদ্ধতিটা।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর আমি অধৈর্য হয়ে পড়লাম। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডেক্‌-এ গেলাম। বিস্মিত আনন্দে দেখলাম, ক্যাপটেন রো, জাহাজের ক্যাপটেন, একা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে পেয়ে আনন্দিত হলাম। সুগঠিত শরীর, বরং একটু খাটো। ছোট ঘন দাড়ি। নিখুঁত এক ন্যাভাল কমাণ্ডার। "প্লেয়ার্স প্লীজ" বরং তাঁর ছবি তুললে পারত। শান্ত সংযত, ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের অগাধ জলরাশির দিকে তিনি চেয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, গুড মর্নিং, ক্যাপটেন। লেফটানেণ্ট হিউয়েস ডাইভ শুরু করার আগে তাঁর সঙ্গে আমি দু-একটা কথা বলে নিতে চাই। কথাগুলো তাঁর কাজে লাগবে। কমাণ্ডার রো হাসিমুখে স্নিগ্ধস্বরে জানালেন, "আমি তাঁকে খবর পাঠাচ্ছি। আপনি গিয়ে ওয়ার্ডরুমে বসুন।" কিছুক্ষণ পরে লেফটানেণ্ট হিউয়েস ক্যাপটেনের সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন। একটি কাগজের টুকরোয় আমি কতগুলি স্কেচ এঁকে দরজা, মালপত্রের ঘর ইত্যাদির স্থান নির্দেশ করলাম আর দরজাগুলো খোলার রীতি বুঝিয়ে দিলাম। লেফটানেণ্ট হিউয়েস আর কমাণ্ডার রো ওয়ার্ডরুম ত্যাগ করে ত্বরিত পদে নিজেদের কাজে চলে গেলেন।

লাঞ্চের পর একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙে দেখি ডাক্তার করনির সুদীর্ঘ আকৃতি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কঠিন কণ্ঠে তিনি বললেন, "একটা বিছানা চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল।" বুঝতে পারলাম

আমার অস্বচ্ছন্দ ঘুমোনোর ভঙ্গি ওঁর বিরক্তি উৎপাদন করেছে। আমি বুঝিয়ে বলি, "কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না।"

ওয়ার্ডরুমে চা পান সেরে বেশ ঝরঝরে লাগছিল; দীক্ষিত আর পাঠকের সঙ্গে গল্প করতে হাসপাতালে গেলাম। তাঁরা তখনো বিছানায় বন্দী। জাহাজের রেডিওতে হেডফোন লাগিয়ে পাঠক বেশীর ভাগ সময় কাটাচ্ছিলেন। তা ছাড়া দীক্ষিতের সঙ্গে গল্প করছিলেন; যখনি কোনো জরুরী খবর ঘোষণা করা হচ্ছিল জানাচ্ছিলেন তাঁকে। দুজনের কাছেই বেশ একরাশ ব্রিটিশ পত্রিকা জমা হয়েছিল। কথা বলতে বলতে অন্ধকার হয়ে এল।

লেফটনান্ট হিউয়েস হাসপাতালের ঘরে সবেগে এসে প্রবেশ করলেন। সবে মাত্র অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে এসে তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কায়িক শ্রমের চিহ্নস্বরূপ হাতের আর কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। চোখদুটো সামান্য লাল হয়ে উঠেছে ঘোলাটে জলের নীচে সন্ধানের অতিরিক্ত আয়াসে। বলিষ্ঠ শরীর আরো বলিষ্ঠ দেখাচ্ছে হ্যাফপ্যান্ট আর টী-শার্ট পরার দরুন। সব ক্লান্তি সত্ত্বেও ওঁর মুখে স্পষ্ট আনন্দের ছাপ, অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করতে পেরেছেন সগৌরবে।

লেফটানেন্ট হিউয়েস সংক্ষেপে দুপুরের পর থেকে তাঁর ডাইভিং-এর কাজের বর্ণনা দিলেন। উনি বললেন, "যখনি আমরা নীচে গেলাম আর বিমানের কোনো একটি অংশে হাত দিলাম, তিনটি শবদেহ ভগ্নাবশেষ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। তিনজনের গায়েই ফাঁপিয়ে-তোলা লাইফ-জ্যাকেট ছিল। একজনের কাছে একটি পাসপোর্ট ছিল, তিনি হলেন—ডি-কুন্‌হা। অপর একজনের আঙুলে নামলেখা সোনার আঙটি থেকে বোঝা গেল যে তিনি পিমেন্টা। তৃতীয় শবদেহটি সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। ভাঙা বিমানে একখানি বই আমরা পেয়েছিলাম, যার উপরে চৌ এন-লাইএর নাম লেখা। যেই আমি বইটা হাতে নিলাম অমনি ওর সব পাতা গলে গেল। হাতে রাখা গেল না, জলে

ভিজে এত নরম হয়ে গিয়েছিল বইখানা। বিমানটি বহু খণ্ডে ভেঙে আছে।" তারপর তিনি ভগ্নাবশেষের বিশদ বিবরণী দিলেন, যতটা তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে দেখে আসতে পেরেছিলেন। পরিশেষে তিনি জানালেন, "যদি আর একদিনও সময় পাওয়া যেত আমরা কেবিনের ভেতরের অবস্থাটা ভালো করে দেখে নিতে পারতাম।"

যে-সব নৌকা অনুসন্ধানে গিয়েছিল তারা সন্ধ্যের শেষে ফিরে এল। তাদের সারাদিনেব সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। কারো চিহ্ন পাওয়া যায় নি, আর জাহাজের কর্মীরা আশা হারিয়েছেন যে আর কেউ জীবিত থাকতে পারে না। বেশীর ভাগ দ্বীপ বসতিপূর্ণ। কোনো একটি দ্বীপের কাছে কেউ গেলে তাকে তুলে নেওয়া হত। তাঁরা সব দ্বীপগুলো ঘুরে দেখে এসেছেন।

আশঙ্কা করলাম, যে দুজন ভাসছিল তারা কোনো ভয়ঙ্কর পরিণতি লাভ করেছে। তাদের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। শুধু দৈবক্রমে আমরা তিনজন ঐ পরিণাম এড়িয়ে গেছি। আটফুট লম্বা হাঙরটির মতো ভয়ঙ্কর জলচর, আর তাদের মতোই ভীষণ বারাকুডা সাগর-সাম্রাজ্য অধিকার করে রয়েছে, অনধিকার-প্রবেশকারীকে নৃশংসভাবে গ্রাস করে।

সেদিন ছিল বুধবার, ড্যাম্পায়ারে ছবি দেখার দিন। একটি 'কাউবয়' ছবি দেখানোর কথা। ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি ছবি দেখতে চাই কি না। ডিনারের পব নটায সিনেমা শুরু হবার কথা। "খুব ভালো হয়," আমি বললাম। "অবশ্য ডাক্তার করনির অনুমতি চেয়ে নিতে হবে," তিনি জানালেন।

ডিনারের পর ডেক্‌এ রেলিংএর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ডেকের শেষের দিকে বড়ো কালো একটা পর্দা টাঙানো ছিল। ওটা আমার অদ্ভুত মনে হল, কিন্তু তখন তার তাৎপর্য বুঝতে পারি নি। জাহাজের তরুণতম অফিসারটির সঙ্গে আমি গল্প করছিলাম। ছেলেমানুষের মতো মুখের জন্যে তাঁকে প্রায় স্কুলের ছেলে মনে হয়। আমাদের কথাবার্তার

প্রায় শেষের দিকে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি সেই রাত্রে কোথায় ঘুমোব। গতরাত্রে ডেকে ঘুমিয়েছিলাম, আর স্বভাবত সে রাত্রেও এখানে ঘুমোব আমি ভাবলাম। গ্রীষ্মকালে কেবিনের ভেতরে বেশ গরম, বিশেষত যখন জাহাজ থাকে গ্রীষ্মমণ্ডলে। কিন্তু গতরাত্রে জাহাজটি স্থির দাঁড়িয়েছিল। সন্দেহ নেই, জাহাজের অগ্রগতির জন্যে আজ রাতে ডেকে খানিকটা বাতাস থাকবে। আমার বেশ ভালো লাগছিল। আর একটু বেশী বাতাস হলেই মন্দ কি? তাই আমি জানালাম আমি ডেকেই ঘুমোব। অফিসারটি তখন ব্যাখ্যা করলেন, ঘুমানোর স্থান নির্বাচনের প্রশ্ন কেন এল। তিনি বললেন, "পর্দার পেছনে ডক্-এর ওপরে শবদেহ-গুলি রাখা আছে। তার জন্যে আপনার অস্বস্তি হবে না তো?" আমার ইতিমধ্যেই ঘুম পাচ্ছিল, অতএব এ-সব নিয়ে বেশী মাথা ঘামালাম না। "মনে হয় না কিছু অস্বস্তি হবে। আমি এখানেই শোব," আমি জানালাম।

ডক্টর করনি আমাদের কাছে এলেন। ছেলেমানুষের মতো দেখতে অফিসারটি ডাক্তারকে জানালেন যে, ডেকে ঘুমোতে আমার আপত্তি নেই। ডাক্তার আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে নীচু গলায় বললেন, "নীচে একটি কেবিনে আপনার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে। শবদেহ-গুলির জন্যে আপনার অস্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে। যাই হোক, আপনার যেমন ইচ্ছে।" এবার আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলাম। বুঝতে পারলাম, ডেকে ঘুম আসা অসম্ভব। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা আগে আমরা সানন্দ পরিবেশে পরস্পর গল্পগুজব করছিলাম। এ নেহাত ভাগ্য যে, আমি এখানে আমার শোবার জায়গা নির্বাচন করছি অথচ ওরা 'নেভির' কফিনে নিদ্রিত। ঈশ্বরের করুণা না থাকলে আমাকেও ঐ রকম একটা কফিনে থাকতে হত। আমি ঘুমোতে পারব না কিন্তু হয়তো নানারকমের দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকব। আমি সবিনয়ে ডাক্তার করনিকে জানালাম যে, আমি কেবিনেই ঘুমোব।

নীচে যেতে হলে ওয়ার্ডরুমের মাঝ দিয়ে যেতে হয়। আমি

ডাক্তারকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলাম। তাঁকে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে সিনেমার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অনুমতি চাইলেন, আমায় চলচ্চিত্র দেখতে দেওয়ার জন্যে। বিনা দ্বিধায় ডাক্তার উত্তর দিলেন, "আমি বিশ্রামের পরামর্শ দিই।" ডাক্তার কর্নির পরামর্শ চূড়ান্ত আদেশের মতো। আর কোনো অনুরোধ করা হয় নি। নিস্তব্ধ ঘর থেকে আমরা কেবিনে গেলাম : যে কেবিন রাতের মতো আমার আশ্রয় হবে।

আমায় কেবিন দেখানো হল। আমার টুথব্রাশ, টুথপেস্ট আগে থেকে সেখানেই ছিল। চলে যাবার আগে ডাক্তার বললেন, "আমি আবার এসে দেখে যাব আপনি ঘুমিয়েছেন কিনা। আর, খুব সকালে ওঠার আপনার দরকার নেই।" বুঝলাম, আমার ভোরবেলায় ওঠা তিনি পছন্দ করেন নি। শুভরাত্রি জানিয়ে শয্যা আশ্রয় করলাম।

বেশ বিব্রত ঘুমের পর ভোর হতে না হতেই জেগে উঠলাম। আর ঘুমোতে পারছিলাম না। ডাক্তার কর্নি অসন্তুষ্ট হবেন এই ভয়ে ওপরে যেতে পারছিলাম না। অতঃপর কী করব ভেবে না পেয়ে ঘরের চেয়ারে বসে রইলাম। অনতিবিলম্বে ডাক্তার কর্নির সুপরিচিত স্বর শুনলাম, "সুপ্রভাত···ভালো ঘুম হয়েছে তো?" তাঁর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা আমার সামনে। আমি সচকিত হয়ে উঠি। যদিও ইতিমধ্যে সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েছি, তবু এত সকালে তাঁকে নীচে দেখব আশা করি নি; কারণ গত রাতে স্পষ্টই তিনি ভোরে উঠতে নিষেধ করেছিলেন। এখন আমি বুঝতে পারলাম ডাক্তার কর্নি কত কষ্ট স্বীকার করছেন। যে কোনো সময়ে ঘুম ভাঙলেই তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি নিশ্চয়ই ভোর থেকে রোগীদের কাছে বহুবার ঘুরে গেছেন।

স্নানের পর ডাক্তার কর্নি আবার আমাকে নতুন ড্রেসিংএর জন্যে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। যখন ক্ষতস্থানগুলো ধোয়া হচ্ছিল সেই সময়ে ডিস্পেনসারির একজন কর্মচারী সুন্দর একটি বেড়াবার ছড়ি নিয়ে এল। আমি বুঝলাম এটি আমার জন্যে। ডাক্তার কর্নি

পরীক্ষা করে দেখলেন আর বললেন, "একটু বেশী বড়ো হয়েছে। এর থেকে ইঞ্চি তিনেক কেটে ফেলবেন..."

"কিন্তু, ডাক্তার--" আমি প্রতিবাদ করতে যাই, "আমার মনে হয় না, আমার সত্যি কোনো লাঠির দরকার।" "তার কারণ," ডাক্তার কর্‌নি কঠিন কণ্ঠে বললেন, "আপনি লাঠি ব্যবহার করতে চান না।" ওই কথাতেই লাঠির প্রসঙ্গ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর উনি ঈষৎ নরম গলায় বুঝিয়ে বললেন, "লাঠি ব্যবহার করলে আপনার ডান পায়ের পাতায় অনেক কম চাপ পড়বে আর তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করবে।" আমি নীরবে মেনে নিলাম। যখন ঘর ছেড়ে আসছিলাম, ডাক্তার দেখে নিলেন লাঠিখানা আমার সঙ্গে আছে কি না।

পাঠক আর দীক্ষিতকে আজ চলেফিরে বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সকলের পরনে বেশ বড়ো মাপের শার্ট আর হাফপ্যান্ট। বিনা চশমায় পাঠককে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। দীক্ষিত শার্টখানা গায়ে দিতে পারেন নি, কাঁধের ওপরে আলগা ভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। দুজনের ডান হাতই ফাঁস দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো ছিল। আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কতকটা বর্মীদের জাতীয় টুপির মতো। পাঠক আর দীক্ষিত জাহাজের কনট্রোল ব্রীজ দেখতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন আর তখনি তাঁদের অনুমতি দেওয়া হল। আমার পা আহত বলে খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাক্তার আমাকে অনুমতি দিলেন।

রাজকীয়ভাবে শ্বেতশুভ্র ড্যাম্পায়ার সাদা দাগ রেখে সিঙ্গাপুর প্রণালীতে প্রবেশ করল। মধ্য আকাশ থেকে বহুক্ষণ সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। ঘন সবুজে ভরা অদূরে দুধারের মাটি ছবির মতো মনোরম। অনেক জাহাজ কাছাকাছি সমুদ্রে নোঙর করা আর বেশ কয়েকটি নদীতে যাতায়াত করছে।

আমরা তিনজন জাহাজের ডানদিকে কোনো গ্যাংওয়েতে বসে ছিলাম, ডাক্তার কর্‌নি আমাদের সঙ্গে। জেটি কাছে আসতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম শ-খানেক ক্যামেরাম্যান উদ্যত হয়ে আছে আমাদের

অপেক্ষায়। সিনেমায় দেখেছি এমন অবস্থায় কী ঘটে থাকে, অতএব কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম। জাহাজ জেটিতে পৌঁছবার আগেই আমাদের কমাণ্ডার রো'র বসার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। আধুনিক আসবাব আর রঙের সামঞ্জস্যে ঘরখানির বেশ পরিমিত অলংকরণের মনোহারিত্ব—কমাণ্ডারের নিজের চরিত্র ও রুচির অভিব্যক্তি। দুটি চীনা ছবি দেয়ালে কিছু বর্ণসমারোহ এনেছে, অন্যথায় ঘরের চেহারা বেশ গম্ভীর।

কমাণ্ডার রো ইতিমধ্যে ডেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ডাক্তার কর্নি আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। এখান থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচর নয়, আর বাইরে কী ঘটছে তাও আমরা জানতে পারলাম না।

প্রচারিত সংবাদ

সিঙ্গাপুর, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৫

ক্যাপটেন বিশ্বনাথন্,* যিনি কাচিং থেকে ফিরেছেন, তিনি বলেন, স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতি তাঁকে বিস্মিত করেছে। বিবৃতিটি দিয়েছেন একজন যাত্রী, মিস্টার পিরোলা, যিনি ঐ বিমানে বম্বে থেকে হংকংএ এসেছেন।

বিবৃতিটিতে বলা হয়েছিল যে, বিমান-কর্মী আর গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়রদের মধ্যে উত্তপ্ত বচসা প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলে। এ সম্পূর্ণ ভুল, তিনি (ক্যাপটেন বিশ্বনাথন) বলেন।

তাঁরা সুবিধে অসুবিধে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, যেমন করা হয়ে থাকে। তাতে কোনো বিরুদ্ধ তর্ক ছিল না। আমি মনে করি, কোনো সঠিক সংবাদ না রেখে বিবৃতি দেওয়া অসঙ্গত---ক্যাপটেন বিশ্বনাথন বলেন।

—সিঙ্গাপুর স্ট্যান্‌ডার্ড

*এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের ডিভিশন্যাল ম্যানেজার

সিঙ্গাপুর, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৫

ব্রিটিশ জাহাজ এইচ. এম. এস. ড্যাম্পায়ার আজ এয়ার-ইণ্ডিয়া ইনটারন্যাশনালের কনসটেলেশনের বিধ্বস্ত বিমান কাশ্মীর প্রিন্সেসের জীবিত ব্যক্তিদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে পৌঁছেছে।

জীবিতদের মধ্যে কো-পাইলট ক্যাপটেন এম. সি. দীক্ষিত, ফ্লাইট ন্যাভিগেটর জে. সি. পাঠক আর মেনটেনেন্স ইঞ্জিনীয়র এ. এস. কারনিক —প্রত্যেকেই আহত হয়েছিলেন তবে জাহাজ থেকে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই যেতে পেরেছিলেন।

১৬ জন নিহতের মধ্যে তিনজনের দেহ ড্যাম্পায়ার বহন করে এনেছে। শবদেহগুলি ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়র ডি-কুন্‌হা, অ্যাসিসট্যাণ্ট পারসার জে-জে পিমেণ্টা আর তৃতীয় দেহটি সনাক্ত করা যায় নি।

-- ইউ পি. এ. ও টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া নিউজ সার্ভিস

গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন

সিঙ্গাপুর। অচিরে আমরা এক অতি পরিচিত স্থানে উপনীত হব। বিধিবদ্ধ কাজের উপলক্ষে আমরা এর আগে অনেকবার এখানে এসেছি। কিন্তু এবারে আর আগের মতো পরিচিত বোধ হবে না। কারণ এবারে গিয়ে হোটেলে উঠব না—উঠব হাসপাতালে। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার আর আমাদের স্বদেশে ফেরার সার্ভিস সে-ই রবিবারে। ততদিন পর্যন্ত আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে নতুন পরিবেশে, নতুন লোকজনদের মধ্যে। বলতে গেলে আমরাই এখন নতুন মানুষ হয়ে গেছি।

তিনজনে গভীর নীরবতার মধ্যে ডুবে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা কইছিলাম। মনে হল, ডাক্তার করনি যেন বহুক্ষণ হল ঘর ছেড়ে গেছেন। কে একজন এখন টোকা দিল। আর কে একজন দরজার হাতল ঘোরাল। কমাণ্ডার রো প্রবেশ করলেন, আর তাঁর সঙ্গে এলেন সিঙ্গাপুরস্থিত ব্রিটিশ নেভাল ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত নৌ-সেনাপতি হিজ একসেলেন্সি শ্রী ট্যাণ্ডন, মালয়স্থ ভারতীয় হাই কমিশনার, এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যালের ডিভিশনাল অপারেশন ম্যানেজার সুদক্ষ পাইলট ক্যাপটেন বিশ্বনাথন, সিঙ্গাপুর এ. আই. আই এর ট্রাফিক অফিস থেকে শ্রী কাউল, আর পরিশেষে ডাক্তার করনি। নবাগতেরা আমাদের সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানালেন। কমাণ্ডার রো, ডাক্তার করনি, লেফটানেণ্ট হিউয়েস আর যত কর্মী ডেকে উপস্থিত· ছিলেন তাঁদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, আর বিশেষত জানাই ডাক্তার করনিকে যাঁর বিচক্ষণ আর অন্তরঙ্গ যত্নে এ যাত্রা সুখপ্রদ হয়ে উঠেছিল। ব্যবস্থা করা হল যে, সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের আমাদের ·সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে গ্যাং-

প্ল্যাঙ্ক-এ পা আমরা রাখলাম তখন থেকে অ্যাম্বুলেন্স অবধি সারা পথ ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আমাদের দিকে চেয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত আমরা সিঙ্গাপুরে কাটালাম। যে কদিন আমরা ওখানে ছিলাম সে কদিনই হিজ একসেলেন্সি শ্রী ট্যাণ্ডন, ক্যাপটেন বিশ্বনাথন আর মিস্টার কাউল আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে যথাসাধ্য করলেন। এমনকি আমরা চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম যে আমাদের দেখাশোনা করতে গিয়ে ক্যাপটেন বিশ্বনাথন নিজেই না ক্লান্তিজনিত অসুস্থতার কবলে পড়েন। এ সম্পর্কে তাঁকে আমরা সাবধান করে দিই।

১৯৫৫ সালের ১৭ই এপ্রিলের সকাল। এ. আই. আই. কনসটেলে-শন মারাঠা প্রিন্সেসে ঘরের পানে ফেরার জন্যে যখন পা রাখতে উদ্যত হলাম, তখন এ কথা চিন্তা না করে পারলাম না যে, মাত্র ছ দিন আগে, এমনি এক সকালে এর অগ্রজা সুদর্শনা কাশ্মীর প্রিন্সেস ঠিক এই রকম রাজকীয় রূপলাবণ্যে হংকংএর কাই-টাক্ বিমান-বন্দরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সব কর্মীরা আনন্দিত আর প্রাণবন্ত। আর এখন তিনজন নিহত, অন্যদের ভাগ্য অজ্ঞাত আর রূপময়ী কাশ্মীর প্রিন্সেসের ছিন্নভিন্ন দেহ সমুদ্রের গভীরে ছড়িয়ে রয়েছে।

কমাণ্ডার প্যাথির রক্ষণাধীনে আরামপ্রদ যাত্রার শেষে বিমানটি বম্বের সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে উপস্থিত হল। জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ করার জন্যে আমরা প্রস্তুত হলাম। আমাদের সব আত্মীয়, সহকর্মী ও বন্ধুরা বিমান ধ্বংসের সংবাদ পাওয়ার পর বহু দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট সময় কাটিয়েছেন। আমাদের প্রত্যাবর্তনের আশা অতি ক্ষীণ ছিল। যখন ডানায় আগুন জ্বলতে দেখেছিলাম, কাগজের মতো জ্বলে যেতে দেখেছিলাম পাখাটিকে, তখন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষীণতম আশাও মাত্র ছিল না। বিমান ভেঙে পড়ার পর জীবিত থাকলেও, আমি জানতাম, অপর ভয়ঙ্কর বিরূপতা আমাদের গ্রাস করতে পারে। জানতাম, দৈবযোগ ভিন্ন এই দুর্বিপাক থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে

না। তবু সেই অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হল। আমি প্রাণ পেলাম, আর নিরাপদে ভারতে ফিরে এলাম।

অপর যাত্রীরা অবরোহণ করার পর, দীক্ষিত বাইরে পা বাড়ালেন, পেছনে আমি আর পাঠক। দেখে উৎফুল্ল হলাম যে মা, বাবা আর কমল বহু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে উপস্থিত আছেন। অবতরণের পর এয়ার-ইণ্ডিয়া ইনটারন্যাশনালের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন।

ফিরে এসেছি, এই অনুভূতি অপূর্ব। এক সপ্তাহ আগে আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্বল্প কালের পটভূমিকায় এ এক সুদীর্ঘ যাত্রা। আমি আর আমার সহকর্মীরা কেবল গ্রেট নাতুনা দ্বীপপুঞ্জ বা দক্ষিণ চীন সাগর পরিক্রমণ করে আসি নি, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সীমান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছি! আর আমাদের মধ্যে পাঁচজন - চারজন সাহসী পুরুষ আর দুঃসাহসিকা এক রমণী ফিরে আসে নি, আর কোন-দিন ফিরে আসবেও না।

প্রচারিত সংবাদ

সিঙ্গাপুর, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৫৫

গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়র শ্রী এ. এস. কারনিক, যিনি এয়ার-ইণ্ডিয়া ইনটার-ন্যাশনালের কাশ্মীর প্রিন্সেসে ছিলেন, বিমানটির দক্ষিণ চীন সাগরে বিধ্বস্ত হওয়ার সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, পোর্ট উইংএ হাইড্রলিক ব্যবস্থায় আগুন লাগাই বিমানটি ধ্বংস হওয়ার কারণ।

---রয়টার

বোম্বাই, এপ্রিল ১৭, ১৯৫৫

এয়ার ইণ্ডিয়া ইনটারন্যাশনালের বিমান কাশ্মীর প্রিন্সেসের তিনজন প্রাণরক্ষা-পাওয়া কর্মী এই মত পোষণ করেন যে, বিমানে বিস্ফোরণ ও আগুনের উদ্ভব কোনো বাইরের জিনিসের থেকে হয়েছে, যার

সঙ্গে বিমানের কাঠামোর কোনো সম্পর্ক নেই; আর, বিমানের কাঠামো, এঞ্জিন, পেট্রল অথবা বিমানের অন্য কোনো অংশ এর উদ্ভবের কারণ নয়।

—ইণ্ডিয়ান এক্‌স্‌প্রেস

বোম্বাই, ২৫শে এপ্রিল ১৯৫৫

"...মাত্র তিনজন জীবিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ভারতীয়। সমুদ্র থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। ইঞ্জিনীয়র এ. এস. কার্‌নিক, যাঁকে ব্রিটিশ জাহাজ ড্যাম্পায়ারে তুলে নেওয়া হয়, তিনি ধ্বংসের সর্বপ্রথম প্রামাণিক ব্যাখ্যা দেন: পোর্ট উইংএ হাইড্রলিক আগুন। সমুদ্রে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বিমানটি তিন ভাগে ভেঙে যায়।......

"এ-সব স্যাবোটাজের চেয়ে সাধারণ দুর্ঘটনার মতোই শোনায়......"

– টাইম, নিউ ইয়র্ক

টাইম্‌স্‌ অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে এ. এস. কার্‌নিক লেখেন:

"...এইচ. এম. এস. ড্যাম্পায়ারের থেকে নামার পর ১৪ই এপ্রিল ক্যাপটেন বিশ্বনাথন আমার নামে পাঠানো পোর্ট উইংএ 'হাইড্রলিক আগুন' সম্পর্কিত বিবৃতির বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সে প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে আমি জানাই আত্মীয়দের কাছে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত দুটি টেলিগ্রাম ভিন্ন আমি অপর কোনো বিবৃতি দিই নি। আমি এ কথা লিখিতভাবে দিতে প্রস্তুত ছিলাম, যাতে তিনি সংবাদের প্রতিবাদ করতে পারেন।

পরে, বোম্বাই এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের অপারেশন ও ইঞ্জিনীয়রিং ম্যানেজারকে আমি আমার নামে প্রচারিত অর্থহীন ভিত্তিহীন বিবৃতির সম্পর্কে জানাই...

এতদ্দ্বারা, কোনো সময়ে এমন কোনো বিবৃতি দানের কথা আমি অস্বীকার করছি।"

—এ. এস. কারনিক

বোম্বাই, ১৮ই মে, ১৯৫৫

ম্যানিলা, ১৪ই মে ১৯৫৫

ইন্দোনেশীয় অনুসন্ধানকারী দলের নেতা ডক্টর ইমাওয়ান কাশ্মীর প্রিন্সেস সাবোটাজ হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত তাঁর দলের অনুসন্ধানকার্য সন্তোষজনক হয়েছে, বিমান ধ্বংস হওয়ার কারণ সাধারণ দুর্ঘটনা।"

— আমেরিকান নিউজ এজেন্সি রিপোর্ট

হংকং, ১৪ই মে, ১৯৫৫

ইন্দোনেশীয় অনুসন্ধানকারী দলের নেতা শ্রী আই ইমাওয়ান, যিনি কাশ্মীর প্রিন্সেস বিধ্বংসের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন, আজ ম্যানিলার ওই সংবাদ অস্বীকার করেন: "অনুসন্ধান এখনো পর্যন্ত সন্তোষজনক আর বিমান ধ্বংসটি একটি সাধারণ "দুর্ঘটনা মাত্র।"

নয়া দিল্লী, ২৬শে মে, ১৯৫৫

ইন্দোনেশীয় এনকোয়ারি কমিটি, যাঁরা গতমাসে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইনটারন্যাশনালের কাশ্মীর প্রিন্সেস ধ্বংস হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন, তাঁরা স্থির করেছেন যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিমানের স্টারবোর্ড হুইল-ওয়েলে একটি বিস্ফোরক মেশিন (বম্ব)-এর বিস্ফোরণের ফলে।

হংকং, ২৭শে মে ১৯৫৫

হংকং সরকার আজ জানিয়েছেন, বিশ্বাসের সর্বৈব যুক্তি তাঁদে আছে যে বান্দুংএর আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে যাবার পথে ভারতীয় বিমানটিকে যে বম্ব ধ্বংস করেছিল সেটি হংকংএই বিমানটিতে প্রোথিত করা হয়।

— রয়টার

বিমান ধ্বংস সম্পর্কে রিপোর্ট

ইন্দোনেশীয় তদন্ত কমিটি বলেছেন, বিস্ফোরণের ফলে ৩নং ট্যাঙ্কে ছিদ্র হয়ে যায় ও অসংযত আগুনের সৃষ্টি করে।

ভগ্নাবশেষের পরীক্ষণে, তাঁরা আরো বলেন, নিশ্চিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, স্টারবোর্ড হুইল-ওয়েলে একটি টাইম বম্ব বিস্ফোরণ হয়েছিল, যার অংশবিশেষ এখনো ভগ্নাবশেষের মধ্যে বেধে আছে।

বিস্ফোরণ যেখানে ঘটেছে সেখানে বিমানের কোনো যন্ত্র বা অংশের সঙ্গে সম্পর্কমাত্র নেই এমন দুমড়ানো, জ্বলে ক্ষয়ে-যাওয়া ক্লর্কওয়াক যন্ত্রের চারটি অংশ পাওয়া গেছে ঐ অংশে টাইম বম্ব রাখা সম্পর্কে অখণ্ডনীয় যুক্তির উদ্ভব হয়েছে, পরিশেষে কমিটি মন্তব্য করেন।

কমিটির অপর অপর অনুসন্ধানের ফল :

(১) বিমান যে আকাশ-চারণের যোগ্য আর যথোপযুক্ত সে প্রমাণ-পত্র তার ছিল।

(২) কর্মীরা অভিজ্ঞ আর যথোপযুক্ত লাইসেন্সের অধিকারী।

(৩) বিমান উপযুক্তমতো বোঝাই করা হয়েছিল আর তেল-পেট্রল যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

(৪) হংকং ত্যাগ (টেক্ অফ) স্বাভাবিক আর আকাশচারণের প্রথম পাঁচঘণ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনাহীন।

(৫) সমুদ্র থেকে ১৮০০০ ফিট ওপর দিয়ে যাবার সময় বিমানের মধ্যে বিস্ফোরণটি ঘটে। তার ফলে স্টারবোর্ড উইংএ আগুন জ্বলে ওঠে আর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে হাইড্রলিক ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা অকজো করে দেয়।

(৬) তৎক্ষণাৎ 'ডিচিং'এর জন্য দ্রুত অবরোহ শুরু করা হয় আর

চরম দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে দক্ষতা ও ধৈর্যের সঙ্গে কর্মীরা সমস্ত জরুরী বিধিব্যবস্থা প্রতিপালন করেন।

(৭) অংশত অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় স্টারবোর্ড উইংএর শেষ প্রান্ত দিয়ে বিমানটি জলে এসে পড়ে আর আঘাতে ভেঙে যায়।

প্রচারিত সংবাদ

লণ্ডন, ১১ই জানুয়ারি, ১৯৫৬

ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিস আজ জানান যে, গত এপ্রিলে চীনা কূটনৈতিক দলকে বান্দুং সম্মেলনে নিয়ে যাবার সময় এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের বিমানে হংকং বিমান বন্দরের এক কর্মচারী স্যাবোটাজ করে ও ফরমোজায় পলায়ন করে···

কুওমিংটাং সরকার তাকে বিচারের জন্যে হস্তান্তরিত করতে অস্বীকার করেন।

অন্তর্ঘাতক ব্যক্তিটি চাও সে মিং ওরফে চাউ-চাউ বলে পরিচিত; সে হংকং ইঞ্জিনীয়রিং করপোরেশনের একজন কর্মী।

"সাক্ষ্যপ্রমাণাদি উপস্থিত হয়েছে," রিপোর্টে বলা হয় "যার থেকে বোঝা যায় যে কুওমিংটাং গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে সংশিষ্ট লোকেরা তাকে সংগ্রহ করে ও পুরস্কারের আশা দেয়।

'৩রা সেপটেম্বর হংকং পুলিশ হত্যার যড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এই লোকটির নামে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পায়।

"পরোয়ানা জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরমোজার কুওমিংটাং কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়, বিচারের জন্যে ওই লোকটিকে ফিরিয়ে দিতে। বার বার মনে করিয়ে দেওয়ার পর ১৪ই ডিসেম্বর এইচ. এম. এর. টামসুই-স্থ কন্সালকে জানানো হয় যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছু করতে পারছেন না কারণ ওই অনুরোধের ভিত্তি আইনসঙ্গত নয়"

····ইউ. পি. এ. আর টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া নিউজ সারভিস্

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ক্যাপটেন দামোদর কাশীনাথ জাতার

জন্ম : বুলন্দ, বেরার, ভারত---১০ জানুয়ারি, ১৯১৪।

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা নাগপুর, পাঞ্চগনি ও পুনায়। দু বছর কলেজের আর্টস্ বিভাগে পড়ার পর দুঃসাহসিকতাপ্রবণ হয়ে সৈন্যবিভাগে যোগ দিতে চান। শর্তাধীন মনোনয়ন হয়, কিন্তু সৈন্যবিভাগের নির্দিষ্ট সংবাদ না পেয়ে বম্বে ফ্লাইং ক্লাবে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে যোগ দেন। দু বছর পর তিনি টাটা এয়ার লাইন্স্-এ যোগদান করেন।

১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে বিপজ্জনক আবহাওয়ার মধ্যে একটি মাঠে বিমানকে ফোর্স ল্যাণ্ড (জরুরী অবস্থায় অবতরণ) করাতে হয়। এই কাজের জন্য অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন বৈমানিক বলে তাঁর পরিচিতি ঘটে।

পরবর্তী কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দেন মালাবার প্রিন্সেসের অনুসন্ধানের সময়, যে বিমানটি ১৯৫০ সালে আল্পস্ পর্বতমালায় নিখোঁজ হয়। বহু সামরিক ও অসামরিক বিমানের মধ্যে, যারা দুদিন যাবৎ বিপজ্জনক তুষার-ঝড়ে আল্পস্ পর্বতমালা তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তিনিই অটুট মনোবলের সাহায্যে বিমানটির আবিষ্কার করেছিলেন।

তাঁর আকাশচারণের জীবনে তিনি বহু মান্যগণ্য লোককে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে গেছেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকে নিয়ে যাতায়াত করার গৌরবও তাঁর হয়েছে।

নিয়তি তাঁর জন্যে নির্ধারিত করেছিল সেই ব্যবস্থা যা তিনি তাঁর পিতামাতাকে বলেছিলেন, যখন তাঁরা তাঁর বৈমানিক-বৃত্তি গ্রহণ করার

সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছিলেন; তিনি বলেছিলেন, "মৃত্যু যখন অবধারিত, দীর্ঘদিন রোগভোগের পর বিছানায় শুয়ে মরার চেয়ে বরং বিমানে মৃত্যুই আমি পছন্দ করব।"

তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। কনট্রোল হুইলে হাত রেখে তিনি তখন বসে ছিলেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পর অশোক চক্র প্রথম শ্রেণী দান করেন, কাশ্মীর প্রিন্সেসকে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতে 'ডিচ' করার সাহসিকতার জন্যে।

তিনি বিধবা স্ত্রী ও তিনটি সন্তান রেখে গেছেন।

ক্যাপটেন মহেশচন্দ্র দীক্ষিত

জন্ম : জব্বলপুর, ২২. ৯. ১৯১৭

সমাসন্ন বিপর্যয়ের মুখে সাহসিকতার জন্যে নিশ্চিত বিপর্যয়ের মুখে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি অশোকচক্র দ্বিতীয় শ্রেণী অর্পণ করেন।

জগদীশচন্দ্র পাঠক

উত্তর প্রদেশের মণিপুরী নামক এক স্থান থেকে তিনি এসেছেন। মণিপুরীর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। ১৯৪৫ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। সেই বছরে ইংলণ্ডে রয়াল নেভিতে শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ লাইসেন্স ইঞ্জিনীয়ার হবার জন্যে হ্যাম্বলের এয়ার সারভিস্‌ ট্রেনিং-এ যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে ফ্লাইট ন্যাভিগেটর হন ও এয়ার-ইণ্ডিয়া ইনটারন্যাশনালে ১৯৫০ সালে যোগ দেন।

১৯৫২ সালে তাঁর বিবাহ হয়। দুটি সন্তানের মধ্যে মেয়েটির জন্ম হয়েছে ১লা মে ১৯৫৫-তে, বিমান দুর্ঘটনা থেকে ফিরে আসার পর।

নিশ্চিত বিপর্যয়ের মুখে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁকে অশোক-চক্র তৃতীয় শ্রেণী প্রদান করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।

কেনেথ ডি-কুন্‌হা

জন্ম : বোম্বাই, ২৭. ১০. ১৯২৮

বম্বের পেডার রোডে 'ভিলা থেরেসায়' প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরে সেণ্ট থেরেসা হাইস্কুলে পড়েন ও সেণ্ট স্টানিস্‌লাম্‌ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইণ্টার-মিডিয়েট ইন-সায়ান্স হন।

সান্তাক্রুজ বিমান-ঘাঁটির কাছেই বাসা হওয়ার জন্যে মাথার ওপর সারাক্ষণ বিমানের গুঞ্জন তাঁকে বৈমানিক হবার জন্য প্রলুব্ধ করত। বাবা-মায়ের অমতে ১৯৫১ সালে আগস্ট মাসে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালে যোগ দেন।

১৯৫২ সালের নভেম্বরে ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়রিংএ আসেন। ৯ই মে ১৯৫৩ সালে ডক্টর জোয়ান পারেরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর অশোক চক্র প্রদান করেন নিশ্চিত বিপদের মুখে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে। তাঁর বিধবা পত্নী ও তাঁর মৃত্যুর পর জাত একটি পুত্র আছে।

সেডরিক ডি-সুজা

জন্ম : পুনা ৫.৯.১৯৩২

শিক্ষা : সেণ্ট জেভিয়ার্স হাইস্কুল এবং পরে ডন্‌ বস্‌কো হাইস্কুল, মাতুঙ্গা, বম্বে। এক বছর কলেজে পড়ার পর ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় যোগ দেন। আশু উন্নতির সম্ভাবনা সেখানে না থাকায় অকটোবর ১৯৫৩ সালে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইনটারন্যাশনালে যোগ দেন। এক বছর পরে তাঁর বিবাহ হয়।

সুদক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে তিনি হকি খেলায় তাঁর স্কুল, কলেজ ও ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে অশোক চক্র তৃতীয় শ্রেণী প্রদান করেছেন নিশ্চিত বিপদের মুখে বিশেষ সাহসিকতার জন্যে।

তিনি তাঁর বিধবা পত্নীকে রেখে গেছেন।

জোসেফ পিমেণ্টা

জন্ম : বম্বে, সেপটেম্বর, ১৯২৫

পড়াশোনা করেছেন সেণ্ট এলিজাবেথ আর ডন্ বস্‌কো হাইস্কুল, বোম্বাই।

ভালো ফোটোগ্রাফার, গত মহাযুদ্ধে ভারতীয় বিমান বহরের এরিয়াল ফোটোগ্রাফারের কাজ করেন। যুদ্ধের পর টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়ার স্টাফ ফোটোগ্রাফার হিসেবে যোগ দেন। এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালে আসেন অক্‌টোবর ১৯৫৩।

নিশ্চিত বিপদের মুখে বিশেষ সাহসিকতার জন্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি অশোকচক্র তৃতীয় শ্রেণী তাঁকে দেন।

তাঁর শোকসন্তপ্ত পিতামাতা, ভাই এরিক ও বোন অনিতার কাছে তাঁর অভাব অপূরণীয় হয়ে রইল।

কুমারী গ্লোরিয়া বেরী

জন্ম : জব্বলপুর, ২৫শে জুলাই ১৯৩২।

করাচীতে পড়াশোনা শুরু করেন এবং হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করেন ক্যাথিড্রেল ও জন্ হাইস্কুল, বম্বেতে। পিয়ানোফোর্টে ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিকের স্থানীয় উচ্চমান পরীক্ষা ১৪ বছর বয়সে পাশ করেন। অঙ্কন আর সূচী-শিল্পে তাঁর আগ্রহ ছিল।

পিতামাতার অমতে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইনটারন্যাশনালে যোগদান করেন।

অনতিবিলম্বে ট্রান্স্-ওয়াল্‌ড্ এয়ারলাইন্‌সের লিস্‌বনস্থিত এক কর্মকর্তার সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল।

দুর্যোগের মুখে দুঃসাহসিকতার নিদর্শন হিসেবে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে অশোক চক্র দ্বিতীয় শ্রেণী প্রদান করেন।

মেজর এবং শ্রীমতী বেরী, বোন সিলভিয়া আর ভাই ট্রেভর এঁদের কাছে এ ক্ষতি অপূরণীয়।

যাত্রিবৃন্দ

চিহ্-আং

জন্ম : ১৯১৪ সালে ; চায়না ন্যাশনাল ইম্‌পোর্ট ও এক্‌সপোর্ট পারেশনে পূর্ব চায়না শাখার ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। ন্যাশনাল ইম্‌পোর্ট এক্‌সপোর্ট করপোরেশনের প্রতিনিধিরূপে নে ছিলেন ও ঐ সংস্থার ডেপুটি ম্যানেজার হয়েছিলেন।

াও-চি

জন্ম : ১৯২০ ; ১৯৫১ সাল থেকে বৈদেশিক বিভাগের ইম্‌ফরমেশন গে কাজ করেছিলেন।

-য়ান

জন্ম : ১৯১৩ ; সাধারণ সেনা, স্কোয়াড-লীডার, বিভাগীয় প্রধান াদিরূপে কাজ করেন, ১৯৫৫ সালে আদর্শ কর্মী হিসেবে চিত হন।

সেন-

জন্ম : ১৯১৫ ; সিনহুয়া নিউজ এজেন্সির ইংরেজী বেতার প্রচার গের ডিরেক্টর ; ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন্ বুরোর ইনফরমেশন ার্টমেন্টের ডিরেক্টর ; কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি সম্মেলনের সময়ে রিয়ান পীপল্‌স আর্মি ও চীনা ভলান্টিয়ারদের সংবাদ প্রচার গের নেতা ছিলেন।

-সো-মী

: ১৯১৬; চায়না পীপলস্ লিবারেশন আর্মির হংকং অফিসে তুদ্-শাখার ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিনহুয়া-নিউজ হংকং শাখার অফিসের কর্তা ছিলেন।

তু-হুং

জন্ম ১৯১৮; উত্তর চায়না সিনহুয়া পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; সিনহুয়া সংবাদ বিভাগে অনুবাদ-সম্পাদক; চায়না পীপ্‌ল্‌স্‌ লিবারেশন আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের রিপোর্টিং সেক্‌শনের কর্তা; কেন্দ্রীয় গণতন্ত্রের বেতারে, বৈদেশিক বেতার শাখার ডেপুটি ডিরেক্টর এবং অল্‌ চায়না জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল।

লী-পিঙ

জন্ম ১৯২৯; সিন্‌হুয়া নিউজ এজেন্সির সংবাদদাতা।

হাও ফেঙ-কো

জন্ম ১৯২৬; সেনাদলের ফোটোগ্রাফার ছিলেন। সংবাদদাতা ও নিউজরীল্‌ ডকুমেণ্টারির ফিল্ম ফোটোগ্রাফার হিসাবেও কাজ করেছেন।

ডাক্তার ফ্রেডরিক জেনসেন

অস্ট্রিয়ান সংবাদপত্রসেবী। চিকিৎসক, লেখক ও কবি। আন্তর্জাতিক বাহিনীর হয়ে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। মাও সে তুঙ-এর আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করেছেন। নবজাত চীনের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ ইয়োরোপীয় জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেছিলেন।

মিস্টার জেরেমি স্ট্রাস্‌—পোলিশ সংবাদাতা।

মিস্টার তুয়োঙ পিঙ্‌ ফুঙ্‌—ভিয়েৎমীন কর্মচারী।

আমরা দুঃখিত যে পুস্তক প্রকাশকালে তাঁদের জীবনী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।